# তসলিমার কলামের জবাব

নাজমা মোস্তফা

প্রকাশিকাঃ
নাজমা মোস্তফা
৬২/সি ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার
নীলক্ষেত ঢাকা- ১০০০
ফোন ৮৬৯৬৩৯

প্রচ্ছদঃ এহতেশাম মোস্তফা

প্রকাশকালঃ জুলাই ১৯৯৬ ইং

কম্পিউটার কম্পোজঃ অপূর্ব কম্পিউটার।
মুদ্রণেঃ অপূর্ব প্রিন্টার্স
১৯০, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৬৩১১৩

মূল্য ৬০.০০ টাকামাত্র।

সূচীপত্রঃ

(১) কুসংস্কারের জঞ্জালে জ্বলছি মোরা (ক)
(২) কুসংস্কারের জঞ্জালে জ্বলছি মোরা (খ)
(৩) নির্বাচিত কলামের নির্যাতিত নারী
(৪) ইসলামের ইজ্জত ইরানের নারী
(৫) পাশ্চাত্যে নারী
(৬) অনেকের চোখে
(৭) ভারতে মিশ্র বিয়ের প্রস্তাব
(৮) যুক্তির মাধ্যমে মুক্তির অন্বেষায়
(৯) তসলিমার তমসার তন্দ্রা কি কাটবে?
(১০) ভিন্ন সম্প্রদায়ের মনিষীদের দৃষ্টিতে
(১১) সংকীর্ণতার গন্ডিতে বাধা ধর্মের মহানুভবতা
(১২) ইসলামে বিয়ে
(১৩) উত্তরাধিকারের গ্যাড়াকলে নাসরিন
(১৪) রসুল(সঃ)এর বিয়ে
(১৫) ইসলামের পর্দায় তসলিমার লজ্জা
(১৬) পর্দার আয়াত
(১৭) **তসলিমা নাসরিনের উত্থানের নেপথ্যে কিছু তথ্য**
(১৮) শিকড়ের সন্ধানে
(১৯) ইসলামপূর্ব জগতের অবস্থা
(২০) উপসংহার

# উৎসর্গ:

যারা আমায় তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন, সত্যের দীপশিখা জ্বালিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন, সেই পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা এর প্রতি উৎসর্গ করলাম আমার এই প্রয়াসটুকু। আমার সুকর্মের অংশীদার তারাও। আল্লাহ তাঁদের অনন্ত জীবন মহাআনন্দের করুক। আজ বাস্তবের সংকীর্ণতার বাইরে তাদের বসবাস। জীবনের অনেক হতাশার রাস্তায় আলো জ্বালতে আজীবন প্রাণান্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এই দুই জোড় মানিক আমার। স্রষ্টার আপনার হোন, আদরের হোন, সম্মানের অংশীদার হোন আমার বাবা-মা।

# ভূমিকা :

ধর্মের মৌলিক জিনিসকে অবজ্ঞা করে সমাজের নানান ত্রুটি বিচ্যুতিই ধর্মের অঙ্গ হিসাবে সমাজের সর্বত্র অনাচার হয়ে ছড়িয়ে আছে আর আমাদের সমাজপতিরা তার প্রতিবাদ না করে বরং প্রতিপালনই করে থাকেন। সে কারণেই আজ এসব তসলিমাদের আবির্ভাব। যুগে যুগে ধর্মের নামেই অধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, আর এ অধর্মের অনাচারকে ঠেকাতে এগিয়ে এসেছে কঠিন হাতে এক শান্তির ধর্ম–ইসলাম।

ইসলামকে নিয়েও ব্যবসা কম হয় নি, এখনও হচেছ, হয়তো আরও হবে। তবু অবশ্যই এই শান্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে সারা বিশ্বময়–এ কুরআনেরই ভাবষ্যদ্বানী।

তসলিমা এবং তারই সহযোগী বেশ কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্বের নাস্তিকতার জবাব এই গ্রন্থখানি। সে হিসাবে তাদের অনেক ভুল, বিভ্রান্তির জবাবে আমার এ সামান্য প্রয়াসটুকু যেন তসলিমাসহ গোটা বিশ্বের হতাশার মাঝে আলোর সঞ্চার ঘটায় এ আকাঙখা রেখেই এ লেখার উপস্থাপনা।

নাসরিনের ভাষায় ইসলাম একটি বিতর্কিত বাজে উপাখ্যান। যার প্রতিবাদ করতে বসেই আমার এ বই লেখা। তাই এ উপাখ্যান যে বাজে নয়, তা প্রমাণ করতে অবশ্য আরো আরো গুণীজনদের সাহায্য সহযোগিতা আমাকে প্রমাণ স্বরূপ খাড়া করতে হয়েছে। যার কারণে অনেক সময় অনেক বিজ্ঞ জনের জ্ঞানগর্ভ কথা ও তথ্য সংগ্রহ করেছি আমার বক্তব্যকে আরো বস্তুনিষ্ট ও জোরালো করার জন্যই।

তাছাড়া আলহাজ্জ ডাঃ জহুরুল হকের 'সহজ সঠিক বাংলা কুরআন' থেকে তসলিমার বিতর্কিত বেশ কিছু আয়াতের বাংলা তরজমা সুবিন্যস্তভাবে দেয়ার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া আরো আরো তরজমা থেকেও আমি উদ্ধৃতি টেনেছি। তাছাড়া ডাঃ হকের তরজমা কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী হওয়াতে পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে আমি এটার সাহায্য নিয়েছি। 'নির্বাচিত কলামের' প্রতিটি আয়াত যেগুলোকে নিয়ে নাসরিন খেলো কথাবার্তা বলেছেন তা আমি অবশ্যই এখানে এনেছি। তাছাড়া বিয়ে, তালাক, পর্দা ও উত্তরাধিকারের নানান ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরার কারণে কুরআনের দৃষ্টিতে পাঠকের কাছে এসব কিছুর একটা ধারণা দেয়ার জন্য আমি অনেক সময় যথেষ্ট সংখ্যক কুরআনের উদ্ধৃতি টানতে বাধ্য হয়েছি।

আমার এ লেখা শুধু তসলিমার প্রতিবাদ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আমার মূল লক্ষ্য আমার দেশের উঠতি তরুণ তরুণীর আশায়ভরা অনাগত ভবিষ্যত; যার দিকে আমরা তাদের সুন্দর জীবনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। বিজয় স্মরণীর মাঠের গত বইমেলার 'মন্তব্য পুস্তিকাতে' আমার দেশের তরুণদের কিছু মন্তব্য আমাকে বেদনাহত করে যার ফলশ্রুতিতে আমি আরো বেশী করে অনুপ্রাণিত হই বইটি লেখার কাজে হাত দিতে। তাই আমার টার্গেট তসলিমা নন, বরং আগত প্রজন্ম। প্রগতির নামে গতিহীনতার শিকার যেন না হয় আমাদের প্রজন্ম। বিভ্রান্ত যুক্তির মানদন্ডে প্রকৃত যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করার বোধ তাদের মাঝে বিকাশ লাভ করুক, এই কামনায় আমার এ প্রয়াসটুকু শুধু তাদের জন্য। খুব স্বল্প সময়ের আয়োজনে আমার এ লেখার প্রথম সংস্করণে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আমি আশা করি আপনাদের সুবিবেচনাই আমার মূল্যায়নের মাপকাঠি হবে।

আল্লাহ হাফিজ।

**নাজমা মোস্তফা।**

# কুসংস্কারের জঞ্জালে জ্বলছি মোরা (ক)

এখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাতের শুরুটা হয়েছে মাত্র। আগামীকাল আমার ছোট ছেলের এস, এস, সি পরীক্ষা। সন্ধ্যের নাস্তাটা সেরে চুলোয় ভাত চড়িয়ে এসে বসেছি কাগজ কলম নিয়ে। মাঝে মাঝে আঁকিবুকি দিই ঠিকই, কিন্তু কোনো বই লেখার কাজে হাত দিতে পারবো এত তাড়াতাড়ি চিন্তা করিনি।

আজ আমার আব্বা বেঁচে নেই। কিন্তু লিখতে বসেছি এ কথাটি শুনলে আব্বা বড্ড খুশী হতেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন কিন্তু ডাক্তারীর পাশাপাশি নেশা ছিল তাঁর অনেক: রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি এসবের সমান্তরালে লেখালেখির হাত তাঁর সচল ছিল। তাঁর পাঁচ ছ'টা বই তিনি জীবিতাবস্থায়ই প্রকাশ করে যান আবার পান্ডুলিপি আকারেও বাংলা ও ইংরেজী বই লিখে রেখে গেছেন, যেগুলো এখনও প্রকাশিত হয় নি। মাত্র বছর গড়িয়ে এলো আমার বাবা অনন্ত যাত্রা করেছেন। তিনি সব সময় আমাদেরে কুরআনের আলোকে দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করতেন। কুরআনের প্রথম নির্দেশনা "ইকরা" অর্থাৎ 'পড়' আয়াতটির উপর উনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন এবং আমাদেরেও স্মরণ করিয়ে দিতেন:

"পড়ো! আর তোমার প্রভু (যিনি লেখাপড়ার মাধ্যমে মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন, আর তোমাকেও নিরক্ষরতা সত্ত্বেও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দান করতে চুড়ান্ত মর্যাদার আসনে বসাতে যাচেছন)। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে (কাজেই এই কালি কলমের জোরে, তলোয়ারের জোরে নহে, কুরআনের বানী প্রচারের কঠোর জিহাদ চালিয়ে তুমি দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষিত তথা জ্ঞানীগুনী বানিয়ে তোলো ২৫: ৫২)।"

"যিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন সব জিনিস) যা সে জানতোই না (২:৩১-৩৩ আর কুরআনের প্রথম প্রত্যাদিষ্ট এই পাঁচটি আয়াতে নিহিত বানীতে তোমার স্রষ্টার পরিচয় ও শিক্ষার গুরুত্ব সম্মন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মানুষের পূর্ণবিকাশ ও মনুষ্যত্বলাভ ঘটবে; কাজেই খৃষ্টান ধর্মমতানুযায়ী অজ্ঞানতার মধ্যেই ধার্মিকতা বিদ্যমান, জেনে ২:১৬-১৭, এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল)" (সুরা আলাক ৩-৪-৫)।

লেখা ছাড়া শুধু পড়া মানুষকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছায় না। মনে পড়ে অনেক আগে সুমন নামের একটা ছেলে আমাকে প্রায়ই বলতো, লিখতে, তখন আমার বড় ছেলেটা তিন চার বছরের মাত্র। নিজে সব সময়ই নিজের পড়া, সংসার, বাচচা-কাচচা এসব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতাম যে তার কথার কেন পাত্তাই দেই নি।

তিন চার দিন আগে তসলিমা নাসরিনের কলকাতা থেকে প্রকাশিত "নির্বাচিত কলাম" বইটি পড়লাম। অনেক দিন থেকেই আমার বড় ইচছা ছিল তাঁর বই পড়ার। খন্ড খন্ড পড়া হলেও কিন্তু বই পড়ার সময় ও সুযোগ এর আগে আর হয়ে উঠেনি। বইটা পড়া অবধি মনে হচেছ আমি কিছু একটা লিখবো, সেটা আমার বিবেকের তাড়না মাত্র। আমি নিজে একদম আনাড়ি, ঐ বললাম না, আঁকিবুকি করেছি মাত্র, -কিন্তু বই লেখার এমন দুঃসাহস আমার এর আগে আর কস্মিনকালেও ঘটেনি। মনে পড়ছে ইংরেজীতে একটি কথা আছে "Every event must have a cause" অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসেরই একটা কার্যকারণ আছে। তাই আমার এই দুর্ঘটনা অনেকটা ঐ গ্রন্থ পাঠের সুবাদেই।

আমি একজন মেয়ে-মানুষ, নাসরিনের ভাষায় যাকে নিয়ে রয়েছে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন?

তসলিমার ভাষাতে 'তবে কি এই-ই সত্য যে নারীর না মরে মুক্তি নেই?' আমি নারী হিসাবে নিজেকে এত হেয় মনে করিনা, কারণ আমি মনে করি আমি সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আশরাফুল মখলুকাত। পুরুষ শাসিত সমাজের সর্বক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি, উশৃংখলতা, পক্ষপাতিত্ব, একদর্শীতা কম বেশী অবশ্যই রয়েছে। তাই বলে বিংশ শতাব্দীর এই ঝলমলে নিয়ন আলোর ঝলকানীর মাঝে নারীর মরে মুক্তি পাওয়ার কোন অবকাশ আমি দেখি না।

বইটা পড়তে যেয়ে তার ভালমন্দ দুটো দিকই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিশুকাল থেকে আজ অবধি সমাজের নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি, বৈষম্য লেখিকার মন ও মগজে অনুরণন তুলেছে এবং এসব দ্বন্ধকে ঘিরেই তার অন্তরে এক ধরণের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রশংসার দাবীদার। লেখিকার 'নির্বাচিত কলামের' শুরুতেই পাই, বারো তেরো বছরের একটি ছেলে জলন্ত সিগারেট লেখিকার হাতে চেপে ধরে, যখন তার বয়স আঠারো-উনিশ। 'মেয়েরা গাছে উঠলে গাছ মরে যায়' মা এর এই সতর্কবাণীর কারণে লেখিকা তার দুরন্ত কৈশোরে ফলবতী বৃক্ষে চড়তে বাধাগ্রস্থ হয়েছেন। হাজার বছরের স্তুপীকৃত কুসংস্কার, অশিক্ষা এসব ধর্মশিক্ষা নয়। ধর্ম মানুষের জন্য এসেছে, মানুষ ধর্মের জন্য আসেনি। এখানে মানুষই প্রধান, ধর্ম তার নিয়ন্ত্রক যন্ত্র মাত্র।

মেয়েরা গাছে উঠলে গাছ মরে যায়।
খালি কলস দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ।
শনি মঙ্গলবারে যাত্রা নাস্তি।
পেঁচা ডাকলে বিপদের আশংকা।
চিরুণী পড়লে কুটুম্ব আসে।

আমি খুব বেশী আর কুসংস্কারের উদ্ধৃতি টানতে পারছি না, কারণ আমি নিজে খুবই মুক্ত পরিবেশে মানুষ হয়েছি যেখানে কোন অজ্ঞানতা, কোন কুসংস্কার কখনোই শিকড় বিস্তার করতে পারে নি। আমার বাবা-মা দুজনাই ছিলেন ইসলামী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। তাই একদিকে মায়ের নির্দেশনা অন্যদিকে বাবার সুচিন্তিত কুসংস্কারমুক্ত মন সবসময় আমাকে যোগ্য দিকনির্দেশনা দিতে সাহায্য করতো, আর তাই আমি শিশুকাল থেকেই সমাজের এই কালো চ্যাপ্টারের মোকাবেলা করে আসছিলাম যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে। আমার এক খালাতো বোনের বিয়ে হয় আমি যখন বি, এ ক্লাসে পড়ছি। সে অন্তঃসত্ত্বা, একদিন তার বাড়ী বেড়াতে গেলাম; বয়সে সে আমার সামান্য ছোট ছিল। যাক, আমাকে দেখে সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে তার জন্য দোয়া চাইতে আমাকে খুব করে অনুরোধ করলো।

ঘটনাটা ঘটেছে এই যে, সে হাতে মেহেদী পরেছে আর তার দুই তিন মাস পরই তার বাচচা হবে, তা দেখে পাশের বাসার খালাম্মা তাকে খুব ধমকে দিয়েছেন যে, কেনো সে বাপের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে মেহদী পরে এসেছে। তিনি রায় দিয়েছেন যে তার পেটের সন্তান তার এই হাতের মতই চিত্রা হরিণের রূপ নিয়ে জন্মাবে। এই ভয়ে তার এই কান্না। আমি যতদূর পারি স্বান্তনা দিলাম এবং মহিলার যুক্তির অসারতা বুঝাতে চেষ্টা করলাম।

পরবর্তীতে আমার তিনবার সিজারিয়ান অপারেশন হয়েছে এবং এই তিনবারই আমি দু'হাতে মেহেদী রাঙ্গিয়ে অপারেশন থিয়েটারে গিয়েছি। আমার ডাক্তাররা আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টাও কম করেননি যে আমাদের পেসেন্ট খুবই রসিক। এত বিপদের দিনেও তার রসের কমতি নেই। আর আমার এ খালাতো বোনের সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে এবার ইকোনোমিক্স-এ অনার্স পড়ছে। সে চিত্রা হরিণ মোটেও হয় নি। আর আমার দু'ছেলের একজন ডাক্তারী পড়ছেন আর আরেকজন এবার এস, এস, সি পরীক্ষা দিচ্ছেন। আর সর্বশেষের অপারেশনের সন্তান ঢাকা মেডিকেলের গাইনীর ডাঃ কোহিনূরের

আন্ডারে ডাক্তারদের অবহেলার কারণে মারা যায় আমার পেটে থাকা অবস্থায়। আমি সব সময় ডাক্তারকে বলছিলাম আমার অপারেশন করে নিতে কারণ আমার আগের দু'টোই সিজারিয়ান অপারেশন, কিন্তু আমার সব কিছু ভালো বলে ডাক্তারেরা গা করলেন না। পরে রাগের মাথায় তাঁদেরে খুনী বলেও গালি দিয়েছি। ডাঃ এজাজ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন আমার গালাগাল শুনেও আমায় স্বান্তনা দিয়েছেন। ডাঃ কোহিনূরকে আমি কড়া কথা বলবো ঠিক করেছিলাম কিন্তু পারি নি শেষ পর্যন্ত যখন শুনলাম তিনি নিঃসন্তান।

"ইন্নাল্লাহা মা'আস্ সা'বিরিন"।

ধৈর্য্যধারীর সাথে আল্লাহ আছেন। তাই ধৈর্য্য ধারণই আমার জন্য উত্তম ঠিক করলাম। ঘটনাটিতে আমার বাবাও ক্ষেপে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছি। কিন্তু আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল ডাক্তারের গাফিলতি, আমার হাতের মেহেদী কক্ষনো নয়। আর ছেলে মানে একদম পুতুলের মত হয়েছিল, শুনেছি সবার কাছে, আমাকে দেখতে দেয়া হয় নি।

ইসলাম এমন এক আলো যেখানে বিজ্ঞানের সাথে তার কোন দ্বন্ধ নেই। বিজ্ঞান মানেই বিশেষ জ্ঞান। আর ইসলাম জ্ঞানের উৎকৃষ্ঠ ভান্ডার। বিজ্ঞান ও ইসলাম ভাইবোনের মত, এ দুই ভান্ডারের কর্তৃত্ব তো একজনের হাতেই।

আমারই এক প্রতিবেশিনী মিসেস বিশ্বাস সতেরো-আঠারো বছরের সংসার জীবন ঘাটলেও স্বামী আজ অবদি তার মুখপানে ভালো করে তাকায়নি। আর ঘরের ছেলে ঘরেও উঠে নি। উড়নচন্ডির মত সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জুটিতে কোনদিনও ভাবের আদান-প্রদান হয় নি। কিন্তু শাস্ত্রের অগ্নি সাক্ষী করে ওদের বিয়ে হয়েছে। মহিলার বাবা গতায়ু আর বিয়ের সাক্ষী অগ্নি, সুতরাং এ বিয়ের নাকি আর কোন পরিণতি নেই, কোন সমাধান নেই। যার কারণে বিচ্ছেদ অসম্ভব। আমি আক্ষেপ করে দিদিকে বলেছিলাম, "দিদি! কি আফসোস, যার জন্য সারা জীবন সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে থাকলেন, থাকবেন, থাকছেন- সে একটি বারের জন্যও আপনার মুখপানে ফিরে তাকালো না।" উত্তরে দিদি বলেছিলেন, "এ ধর্মে আচার আছে ভাই, বিচার নেই।" কথাটা আজো আমি ভুলতে পারি নি।

ধর্মের দেয়া মেকি শিকলে মিঃ বিশ্বাস নিজের বিয়ে নিয়ে বড়ই বিপাকে আছেন। মিঃ বিশ্বাস বলেছিলেন, "হিন্দু ধর্ম একখানি স্রোতহীন ধর্ম। এ ধর্মে কোন গতিশীলতা নেই। এ ধর্মে মুক্তির রাস্তা নেই।" সারা জীবন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নাম সই করে যেতে হবে যদিও কাজে কর্মে কোনই সম্পর্ক নেই দু'জনাতে। সমাজের এমনি সব আচার-অনাচার কুসংস্কারের বিরূদ্ধেই চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এসেছিলেন একখানি অস্ত্র নিয়ে সেই মহামানব, শুধু মুসলমানের নবী হয়ে নয়, বিশ্ব মানবের অবতাররূপে, মুক্তিদাতারূপে। তিনিই বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা(সঃ)। এ ব্যপারে কুরআন কি বলে দেখুন।

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না" (সুরা সাবা: ২৮ আয়াত)।

হিন্দু ধর্মে শুদ্রদেরে ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকার দেয়া হয় না। এটা নাকি ব্রাক্ষ্মণের একার সম্পত্তি। আসলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন পারসিক বলে কোন কথা নয়, সবই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। সকল মিথ্যার অবসান ঘটিয়ে সত্যের বিজয় কেতন উড়াবার মিছিলে সবাই এক হোন। সত্যের পতাকাতলে সবাই সমবেত হোন। দলিত মথিত করে ফেলুন সমস্ত অন্যায়ের পাপাচারের বেড়াজাল। শুধুমাত্র টিকে থাকুক নির্জলা সত্যটুকু।

আজও আমাদের সমাজে, পরিবারে সর্বত্র আমাদের পূর্ব পুরুষদের নানান কুসংস্কার, নানান অনাচার আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছে। বিচিত্র কি, আমারই পূর্ব পুরুষ হয়তো বা মঙ্গলঘন্টা বাজিয়ে স্থানে স্থানে শক্তির পূজা করেছিলেন - কখনো সূর্যকে, কখনো চন্দ্রকে, কখনো গরু, সাপ, গাছ, পাহাড়কে। সে হিসাবে আজকের শক্তিপূজকদের উচিত ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, কম্পিউটার, রোবটকে পূজা দেয়ার। কারণ এসবের শক্তির কাছে সাধারণ মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি হার মানে। আর এই সব শক্তি পূজকদের ব্যাপারে আল্লাহ কি বলেন, দেখুন -

"যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা তাদের কর্মসমূহ ভস্মসদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না। এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি" (সুরা ইব্রাহিম: ১৮আয়াত)।

"যারা কুফরি করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছুই নয়" (সুরা নূর: ৩৯আয়াত)।

প্রত্যেক জিনিসই তার মূল্যবোধের মাধ্যমে ভালমন্দরূপে গ্রহনীয় হওয়া উচিত। ইসলামে কোন কালেই ধর্মে জোর জবরদস্তী স্বীকৃত নয়। যারা ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করে না বা বুঝতে চায় না তাদেরকে আল-কুরআনে কাফেরুন বলা হয়েছে। কাফেরুন অর্থ সেই সব লোক যারা নিজেদেরকে আড়াল করে রাখে অর্থাৎ ইসলামের পরিভাষায় যারা ইসলামের কাছ থেকে নিজেদেরকে দুরে রাখে বা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখে।

পড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন নাসরিনের বাবা, কিন্তু আফসোস নাসরিনের জন্য! শত ফুল থেকে মধু আহরণ করে মৌমাছি অবশেষে মৌচাক গড়ে তোলে। সব ধর্মের নির্যাস ঘেটে যদি সামান্যতম মধু মতাদর্শ বা দিক নির্দেশনা তিনি সমাজকে দিতে পারতেন বা নিজেও গ্রহণ করতে পারতেন তবে তার সাহিত্যিক জীবন ও মানব জীবন ধন্য হত। একটা আগাগোড়া জগাখিচুড়ী চিন্তাধারার ধারক তিনি, না ঘরকা, না ঘাটকা।

মানুষের জীবন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধ্যক্য এই চারটি ধাপের সম্মিলিত সোপান। তিনি শুধু তৃতীয় ধাপটিকে লাভে-লোকসানে উসুল করার তাগাদায় ব্যস্ত থেকেছেন। আর জীবনের বাকী ধাপগুলোকে বিড়ম্বনার মাঝে ফেলে দিয়েছেন। তার উদ্দাম স্বাধীনতার ফসল হবে অজস্র জারজ সন্তান, উশৃংখল কৈশোর, মদোন্মত্ত যৌবনদীপ্ত স্বাধীনতা আর মৃত্যুর বিভীষিকার মাঝে পড়ে থাকা হতাশার বার্ধ্যক্য। এই হলো তার আদর্শের পরিণতি।

"যে দেশের অধিকাংশ নারীই বস্ত্রহীনতায় ভোগে, সে দেশে কাপড়ের উপর কাপড় পরিধান দৃষ্টিকটু তো ঠেকেই, বৈষম্যের ব্যবস্থাগুলোও আরো বেশী প্রকট হয়।"

নাসরিনের উপরোক্ত বক্তব্যটা আসলেই কি সঠিক? অর্থনৈতিক পুষ্টিতে ভরপুর পাশ্চাত্যের অফুরন্ত প্রচুর্যের ভেতরে নারীদেহের কাপড়ের স্বল্পতা কি এটাই প্রমাণ করেনা যে, প্রাচুর্যে ভরা সভ্যতাতেও কাপড়ের ক্রাইসিস অত্যন্ত প্রকট? পাশ্চাত্যের মহিলারা শরীরের উপর নীচের প্রায় উদোম রেখে মাঝখানে একটা কিছু পরে সভ্যতার চিহ্ন বহন করে বেড়ান। আর হতদরিদ্র দেশে আমাদের কাপড়ের এমনই স্বল্পতা দেখা দেয়নি যে, স্রষ্টার নির্দেশ পালন করার জন্য একখানি স্কার্ফ, ওড়না বা চাদরের বাজেট আমরা যোগান দিতে পারবো না। পাশ্চাত্য সভ্যতার দেশে দেখা যায় কাপড় না পরা বা প্রায় উলঙ্গ থাকাটাও এক ধরণের গ্ল্যামার বলেও দিব্যি চালানো যায়। আমাদের তসলিমা এসবের হাতছানিতে এই মেকী গ্ল্যামারের গ্লানিতে

তার উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে মেকি জিনিসটাকে বড় করে দেখেছেন বলেই তার মাঝে এই ব্যাল্যান্সএর ব্যাপারটা সঠিক দিকদর্শন পায়নি। চিরটা কাল তিনি ভেবে আসছেন যে তিনি প্রচন্ড নির্যাতিতা। আসলে উন্নত অনুন্নত উভয় সমাজেই ভিন্ন আকারে নারীরা পন্য আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারোর কপড়ের সল্পতা কারো মনের দৈন্যতায় উভয়েই আক্রান্ত উন্নত মন মানসিকতার অভাবে।

# কুসংস্কারের জঞ্জালে জ্বলছি মোরা (খ)

আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী মাথায় কাপড় দেয়াতে নাসরিনের বেজায় আপত্তি। আজীবন আপনার মা-চাচী সবাই মাথায় কাপড় দিলেন আর আজকের আধুনিকা নাসরিন নিজের মাথাকে উলঙ্গ রেখে পুরুষের সাথে সমতা আনার চেষ্টা করছেন। রাজনীতির কারণে যদি নেত্রীরা মাথার কাপড় দেন, তবে মুসলিম হিসাবে আমিও খুশী হবো না। তবে আমার বিশ্বাস প্রতিটি মুসলিম নারীরই স্রষ্টার নির্দেশ পালন করার নিমিত্তে মাথায় কাপড় তোলা উচিত।

এই তো কিছুদিন আগে মনে পড়ে এক বিয়ের জলসা থেকে ফিরছিলাম আমরা ছ'জন মহিলা। পাঁচ জনার মাথাই খোলা ছিল, ব্যতিক্রম ছিলাম আমি। হঠাৎ করে এর মধ্যে এক মহিলা বলে উঠলেন, "ভাবী আপনার এমন সুন্দর মুখখানা ঢেকে রেখেছেন কেন?" বস্তুতঃ আমি বাইরে সব সময়ই মাথায় স্কার্ফ বা একটা হেড কাভারিং ব্যবহার করে থাকি। আরো অনেক কথার মাঝে মহিলার কথাও হারিয়ে যায়। বিয়ের আনন্দ জলসা থেকে ফেরার পথে আমি উপস্থিত সবার মাথা খোলা দেখে মহিলার প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তর করি নি। তবে একান্তে ঐ মহিলাকে আমার কিছু স্পষ্ট কথা বলার প্রয়োজন ছিল। কারণ জীবনের একটি চরম সত্য কথা হয়তো তিনি জানেন না বলেই এসব ব্যাপারে রসিকতা করতে পেরেছেন। মেয়েদের হেড কাভারিং বা মাথা ঢাকা আল্লাহর দেয়া স্পষ্ট নির্দেশ। যদি কেউ এটা অমান্য করে তবে সে স্রষ্টাকেই অমান্য করলো।

পুরুষ শাসিত সমাজের কারো রক্তচক্ষুর ভয়ে আমি আমার আঁচল মাথায় চড়াই নি। এ আমার দাসীর চিহ্ন নয়। আমি মানুষ, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব আমি। স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করাই আমার কাজ। আর আমার মাথার আঁচল আমার পরিচয় বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে যে আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে পরোয়া করি না। শুধু মাত্র আল্লাহকে পরোয়া করি বলেই মাথায় আমার বিজয়ের চিহ্ন। পৃথিবীর যে কোন জনপদে যে কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাকে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে আমি প্রতিনিধিত্ব করছি এক জনেরই, সে আর কেউ নয়, আল্লাহ।

কিন্তু আফসোস! নাসরিন আপনার কোন চিহ্ন নেই। আপনাকে দেখে বুঝার উপায় নেই যে আপনার পরিচয় কি? শত মুখে বলছেন এ দেশে আপনার যোগ্য একটা পুরুষও জন্মায় নি। তাও আবার এরি মধ্যে তিন তিন জন পুরুষকে মাড়িয়ে এসেছেন; একজন তো ইহধাম ছেড়ে চলেও গিয়েছেন। যাক এ ব্যাপারে আপনার কথায় ও কাজে যথেষ্ট মিল অমিল দুই-ই আছে।

আপনার বাবা-মায়ের লড়াইয়েও আপনার বাবাই সম্ভবতঃ পুরুষ মানুষ তো তাই জিতেছেন। আপনার মা রান্না শেখাতে তাগাদা দিতেন আর আপনার বাবা পড়ার তাগাদা দিতেন। বুঝা যায় আপনি রান্না শেখেননি, শুধু পড়তে শিখেছেন। তবে আপনার বাবা আপনার পড়ার ব্যাপারে তৃপ্ত হতে পেরেছেন এমন কথা আমি পাই নি এ পর্যন্ত। আপনার বাবা-মা সম্ভবত দু'জন দুমেরুর মানুষ। তাই দুজনেই সংসার করলেও দুজনাই একা।

আপনার বিতর্কিত কিছু কলামের উপর আমি আপনাকে তথ্যগত ধারণা দেয়ারই চেষ্টা করবো। অনেক জায়গায় আপনি নামাজ নিয়ে খেলো কথাবার্তা বলতে পেরেছেন কারণ নামাজের মর্ম আপনি অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। ইসলামে আসলে কোন ধরণের পূজাই স্বীকৃত নয়, তা পীর পূজাই হোক, আর মূর্তি পূজাই হোক, কবর পূজাই হোক আর মাজার পূজাই হোক। মৌল ইসলামে একমাত্র আল্লাহর

একত্বই স্বীকৃত। এখানে আর কোন ইলাহ নেই। পীর, পুরোহিত, তাবিজ, কবজ যে সবের উপর আপনি ধিক্কার দিয়েছেন, ওগুলো ইসলামের জিনিস নয়।

আর নামাজ মুসলমানের এমন একটা ধর্মানুষ্ঠান যেখানে আমার আর আমার স্রষ্টার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আমার স্রষ্টাকে ধরতে হলে মন্ত্রী মিনিস্টারের দরবারে দৌড়াতে হয় না, পীর পুরোহিতের বাড়ী লাইন দিতে হয় না। আমার পর্ণ কুটিরে বসেই আমি তাঁর সথে যোগাযোগ করতে পারি, এটাই আমার উত্তম মাধ্যম। তাছাড়াও দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে সর্বাবস্থায় আমি স্রষ্ঠার সাহায্য চাইতে পারি। আমি মেয়ে হয়েও পারি, এর জন্য কোন পুরুষকেও আমার ধরতে হয় না, আমি একাই একশ।

হাবিবুল্লাহ নামক ছেলের সাথে আপনি বন্ধুত্ব করতে চেয়েছেন আজীবন, কিন্তু হাবিবুল্লাহর প্রেমের ডাকে আপনি মর্মাহত হয়েছেন। ঘৃণায় তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে আপনি স্বীকার করেছেন যে ছেলে মেয়েতে আসলে বন্ধুত্ব হয় না। আপনারা পাঁচ বছর এক সঙ্গে পড়েছেন, চলেছেন। হাবিবুল্লাহ কখনো আপনার আঙ্গুল স্পর্শ করার লোভ করে নি। হাবিবুল্লাহ ফেরেশতা ছিলেন কি না জানি না। তবে আজকাল আর হাবিবুল্লাহদের মত এরকম ফেরেশতা খুব একটা দেখা যায় না।

আজকাল আপনাদের নব্য কালচারের জোয়ারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জোড়ায় জোড়ায় ঢলাঢলি করে চলে বেড়ান, তা রাস্তাঘাটে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে পাশ্চাত্যের বাতাস লাগানো বুঝি? নব্য শহুরে কালচারের মাঝে নিজেকে বিকিয়ে দেয়ার মানেই কি আধুনিকতা? উশৃংখলতার মাঝেই কি জীবনের সার্থকতা? লাগামহীন উচ্ছলতাই কি স্বাধীনতা? সোহরাওয়ার্দির চত্বরে হাঁটতে যান, রমনা পার্কে ধানমন্ডি লেকের ধারে দেখে আসুন আগত প্রজন্ম কেমন নেশাখোর হয়ে পড়ে আছে প্রেমের মদিরতায়; নিজের বয়সের কাছে তারা পিছলে পড়ছে। অনাগত সুন্দর ভবিষ্যৎটাকে প্রেম প্রেম খেলা খেলে জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। সামনে তার অফুরন্ত জীবন ভান্ডার উন্মুক্ত।

আপনারা সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহের কথা বলছেন, খুব সুখের কথা, এসব প্রথা সমাজকে পঙ্গু করে রাখে, কোমর সোজা করে দাঁড়াতে দেয় নি ঠিকই। কিন্তু পাশাপাশি সমাজে নারীপুরুষের সমতার নামে বেহায়াপনার যে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন তাতে উঠতি কৈশোর, যৌবন বিপন্ন অবস্থার সম্মুখিন হচ্ছে। নষ্ট কৈশোর, নষ্ট যৌবন দিয়ে একটা ছেলেমেয়ের জীবনকে হত্যা করার এমন কোন ষড়যন্ত্র কোন সাহিত্যিকের থাকা উচিত নয়। এ দেশের আলো বাতাসে আমরা লালিত। আমাদের ঋণ কখনো শোধ হবার নয়। আমাদের কর্ম দিয়েই আমাদের ঋণ শোধ করতে হবে।

আমার দু'খানা ছেলে মাত্র। জগত জোড়া লক্ষ লক্ষ ছেলে, কোটি কোটি মেয়ে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা পাক, দিশেহারা জীবন-তরণীর উত্তাল উন্মত্ততার মাঝেও নিজের দিশা ঠিক করে নিতে ওরা সচেষ্ট হোক। ওরা সার্থক মানুষ হোক, ওরা সার্থক প্রেমিক হোক, ওরা আদর্শের ধারক হোক। আমার দেশের ছেলে-মেয়েরা যদি সঠিক আদর্শ চিহ্নিত করে নিজের ভালোমন্দ স্থির মস্তিষ্কে ঠিক করতে পারে তবে ইনশাআল্লাহ এ গোটা বিশ্ব জয় করতে তাদের থোড়াই পরোয়া করতে হবে।

নাসরিনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তিবাদী কথাবার্তা আমার মত যুক্তিবাদী মানুষকে আকৃষ্ট করলেও অনেক ক্ষেত্রে আমার মনকে প্রতিবাদীও করে তুলেছে। বিভিন্ন ধর্মের অসারতার যে ছবি তিনি তুলে ধরেছেন তার ভূমিকা আমরাও ইতিহাস ঘাটলে পাই, সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে কিছু বাড়াবাড়ি বা বুঝার কমতিই সম্ভবতঃ তাকে এমন ইসলাম বিদ্বেষী করে তুলেছে।

তাই আমি সব সময়ই চেষ্টা করবো তথ্য ভিত্তিক কিছুটা ধারণা দিতে। আমি তার ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করবো আর আমার দেশের ভাইবোনদের, ছেলেমেয়েদের কাছে আমি যতটুকু বুঝেছি ততটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করবো। তবে জেগে যদি কেউ ঘুমানোর ভান করে তবে তার ঘুম ভাঙ্গানো যায় না। যদি কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করে তবে আমার বলার কিছুই থাকবে না। তবে আমার প্রয়াসটুকু রইলো মাত্র। জগতের, সমাজের, আমার দেশের, গোটা বিশ্বের ভালো আমি চাই। কারো ক্ষতি করা, কারো অমঙ্গল করা আমার ইচছা নয়। পুরুষ নারীতে কোন বৈষম্য স্রষ্টা সৃষ্টি করেনি, করেছে মানুষ। আর পুরুষ আমার সর্বনাশ করেছে বলে আমিও তার সর্বনাশ করবো এ বোধ আমার নেই। আমি উত্তম হতে চাই কারণ আমার পরিচয় 'আশরাফুল মখলুকাত'। আমার পরিচয় পুরুষ নারীতে নয়। "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইবো না কেন?" এই নীতিতেই আমি বিশ্বাসী।

পীরতন্ত্র, কবরপূজা, মাজারপূজা সম্বন্ধে নানান কুসংস্কারের অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি আপনি দাঁড়িয়ে। এসব কক্ষনো ইসলামে স্বীকৃত নয়। এ সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি আমি নীচে দিচ্ছি। পীরতন্ত্র, শিরকী প্রথার বিরুদ্ধে কুরআন কি বলে দেখুন –

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে (এই জন্য নয় যে তিনি দেবদেবীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ন, বরং এর কারণ এই যে, এতে মানুষের মর্যাদা যার পর নাই ক্ষুন্ন হয়, কেন না আল্লাহ মানুষকে তার প্রতিনিধিরূপে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, ২:৩০ এবং সারা বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষেরই সেবার জন্য ১৪:৩৩, কাজেই মানুষ যদি মনিব হয়ে চাকরের কাছে জী হুজুর করে, সাহেব হয়ে গোলামকে কুর্নিশ করে, রাজা হয়ে প্রজার পায়ে মাথা ঠেকায় তবে এর চেয়ে লন্ডভন্ড কান্ড আর কি হতে পারে?), আর তাছাড়া আর সব (ভুলভ্রান্তি পাপাচার) তিনি ক্ষমা করেন যার জন্য (উপযুক্ত বিবেচনায়) তিনি ইচছা করেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করে সে তাহলে উদ্ভাবন করেছে বিরাট পাপ (তথাপি আল্লাহর সাথে পাল্লা দেবার পরেও তারা যদি অনুতাপ করে ও নিজেদের জীবনধারা সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহর করুণার দ্বার রয়েছে সদা উন্মুক্ত" (সুরা নিসার ৪৮, ১১৬ আয়াত)।

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি কি তাদের (পীর ফকির ও সাধু সন্ন্যাসীদের) দিকে চেয়ে দেখো নি যারা (আর তাদের মুরিদ শিষ্য-সাগরেদদের থেকে তাবেদারী দাবী করে ২৯: ১২)? না, (আল্লাহকে তাদের ব্যবসার পণ্য করার জন্য ও লোককে ধাপ্পা দিয়ে ফুঁক ও থুক দেয়া পানি খাইয়ে এবং তাবিজ কবজ বিলিয়ে লোকঠকানো ধান্ধা ফাঁদার জন্য তারা পবিত্র তো নয়ই, বরং) আল্লাহ পবিত্র করেন (নির্ভেজালভাবে তাঁরই প্রতি অনুগত বান্দাদের) যাদের তিনি পছন্দ করেন (অতএব বিশুদ্ধ জল পেতে চাইলে নোংরা খাল-বিল-ডোবা প্রভৃতির ন্যায় ধাপ্পাবাজদের খপ্পরে না পড়ে, ৩৯:৩, বরং সোজা ঝরনার উৎস স্থলে চলে যাওয়াই শ্রেয় ২৯:৬৯)। আর (যারা এই সব দালাল তুল্য লোকদের খপ্পর এড়িয়ে সোজা আল্লাহর শরণাপন্ন হয়) তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না খেজুর বিচির পাতলা আবরণ পরিমাণেও" (সুরা নিসার ৪৯আয়াত)।

"আর যারা অবিশ্বাস করে (এবং পীর ফকির ও সাধু সন্নাসী সেজে বেহেশত দুযখের কন্ট্রাকটরি করে) তারা যারা (আল্লাহ ও রসুলের প্রতি) বিশ্বাস করেছে তাদের বলে: (আমাদের মুরিদ শিষ্য হয়ে) আমাদের পথ অনুসরণ কর, তাহলে আমরা (পরকালে) তোমাদের পাপ বহন করবো (এবং বেহেশতে সিট রিজার্ভ করে ঢুকিয়ে দেব)।" বস্তুতঃ তারা তো ওদের পাপের থেকে কিছুরই ভারবাহক হবে না (কেন না তাদের নিজেদের পাপের বোঝায় তাদের ঘাড় ভেঙ্গে যাচেছ, আর কারোর ঘাড়েই তো দুটো মাথা থাকে না, তাই প্রত্যেককেই নিজ নিজ বোঝা নিজের মাথায় বইতে হবে, ৬:১৬৫) নিঃসন্দেহ (যারা অন্যের পাপের ঝুড়ি বওয়ার ঝুট ওয়াদা করে কুলি মজুরের ন্যায় পয়সা কামাতে দ্বিধা করে না) তারাই মিথ্যাবাদী" (সুরা আনকাবুত ১২ আয়াত)।

"আর তারা তাদের (পাপের) বোঝা অবশ্যই বইতে, আর তাদের (আপন) বোঝার সঙ্গে (তাদের চেলাদের) অন্য বোঝাও (তাদের বইতে হবে, কেননা তারাই তো শিষ্যদের আল্লাহর বন্দেগীর নামে তাদের তাবেদারীতে নিয়োগ করে ওদের পাপের ঝুড়ি ভারী করে দিয়েছিল, ১৬:২৫) আর কিয়ামতের (শেষ বিচারের) দিনে তাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে যে (মিথ্যা পীর মুরশিদি ও সন্ন্যাসগিরি) তারা উদ্ভাবন করেছিল সে সম্বন্ধে" (সুরা আনকাবুত এর ১৩ আয়াত)।

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (মিথ্যা দেবদেবী, ভন্ড পীর ফকির ও সাধু সন্ন্যাসী, অন্ধ বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত উদ্ভট আচার অনুষ্ঠানে, ঝাড় ফুঁক তথা তাবিজ কবচ ও গ্রহরত্নের উপর ভরসা ও আস্থা স্থাপনের দ্বারা ঐসব নিরর্থক বিষয়বস্তুর ন্যায়) অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে (২৫:৪৩) তাদের উপমা হচ্ছে মাকড়সার দৃষ্টান্তের ন্যায়, সে নিজের জন্য (নানান ধরণের পরিকল্পনা করে ও নকশা কেটে) ঘর বানায়, অথচ নিঃসন্দেহ সবচেয়ে ঠুনকো বাসা হচেছ মাকড়সারই বাসা, যদি তারা জানতো (যে বুদ্ধি বিবেচনাহীন লোকের অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যারা কুসংস্কারের মায়াজাল বোনে নির্বোধ লোকদের তাতে জড়াতে চায় তাদের ক্রিয়াকলাপ ইসলামের দুর্বার অগ্রগতির প্রথম আঘাতেই মাকড়সার জালের ন্যায় ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)" (সুরা আনকাবুত এর ৪১আয়াত)।

# ‘নির্বাচিত কলামের’ নির্যাতিত নারী

নাসরিনের নির্বাচিত কলামের সবচেয়ে আলোচিত পয়েন্ট এই নির্যাতিত নারী। শুরুতে জলন্ত সিগারেটের আঘাতে পোড় খাওয়া দেহের বেদনার ক্ষোভ দিয়েই লেখিকা নিরীহ নারীদের নির্যাতনের ইতিহাস থরে বিথরে বলে গেছেন। নাসরিনের মত নাজমাও তো নারী, তাই স্বভাবতই স্বজাতির বেদনায় আমি অবশ্যই মর্মাহত।

আলো আর অন্ধকার, শিক্ষা-অশিক্ষা, কুশিক্ষা-সুশিক্ষা সবই দিন রাতের মত একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে আছে। তবে নারী নির্যাতনের জন্য নাসরিন শুধুমাত্র দায়ী করেছেন পুরুষ শাসিত সমাজের সমাজপতিদের, পুরুষদের। আমাদের সমাজের বঞ্চনার জন্য শাসিতের একনায়কত্ব অনেকাংশে দায়ী বটে, তবে এটিই একমাত্র কারণ বলে আমি মনে করি না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর অন্ধকারের সাথে যাদের বসবাস তারা তো বারে বারে হোঁচট খাবেই।

শিক্ষার আলোই নারীকে মুক্তি দেবার একমাত্র বাহন। এটাই আমার বিশ্বাস। বৈদিক যুগ,শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বশিষ্ট ধর্মসূত্র, আপাস্তম্ভ ধর্মসূত্র, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, মৈত্রায়নী, সংহিতা ইত্যাদি থেকে নানান উদ্ধৃতি দিয়ে লেখিকা নারী জনমের অসারতা তুলে ধরেছেন গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে।

লেখিকার ভাষায় শকুনি, নেউল, ছুঁচো, কুকুর, শুদ্র ও নারীর মধ্যে শাস্ত্র কোনো পার্থক্য করে নি। শাস্ত্র করেনি বলে সমাজও করেনি। বৈদিক ভারতবর্ষ নারীকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের সমাজ নারীকে যতটুকু অসম্মান করেছে, তিন হাজার বছরও বর্তমান খৃষ্টাব্দের সমাজ ভিন্ন কৌশলে ভিন্ন ব্যবস্থায় নারীকে একই রকম অসম্মান করে যাচ্ছে।

লেখিকা তার নির্বাচিত কলামের পনেরো পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, “মেয়েদের কোরান শিক্ষা দেওয়া হতো স্বামীর মঙ্গলের জন্য যেন সে দোওয়া দুরুদ পড়তে পারে।”

সাহিত্য সৃষ্টি করার নামে মিথ্যার বেসাতি করা তো কোন সাহিত্যিকের কাজ নয়। কোন ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না নিয়ে কোন কথা বললে উপস্থিত চমক আনা যায় হয়তো বা, কিন্তু তা কোন আদর্শ স্থাপন করতে পারে না। আপনার এই ঠুনকো কথাটা কেমন করে কুরআন উড়িয়ে দিচ্ছে দেখুন –

“আর যে কেউ কোনো ত্রুটি বা পাপ অর্জন করে, তারপর (উদর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে) এর দ্বারা দোষারূপ করে নির্দোষকে (১২:৭০), সে তাহলে নিশ্চয়ই বহন করেছে কলঙ্কারোপের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা” (সুরা নিসার ১১২ আয়াত)।

এখানে পুরুষ নারী বলে কোন কথা নেই। প্রত্যেককে প্রত্যেকেরই বোঝা বহন করতে হবে। একের পাপ অন্যে খন্ডানোর কোন জালিয়াতি সিস্টেম কুরআনে নেই। সব সময় কুরআনের সত্যতাকে প্রকাশ করার স্পষ্ট নির্দেশ কুরআনে আছে। ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা না করতেও কুরআনই হুশিয়ারি উচচারণ করেছে। ‘স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত’ বলে কোন প্রমাণ কুরআন হাদিসে নেই। বরং নারীর সম্মানার্থে হাদিসের উদ্ধৃতি আছে “মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশত।” আপনারা শোনা কথাকে,

পৌরানিক গালগল্পকে ব্যবসায়িক কথাকে ইসলামের অঙ্গীভূত করবেন না। ইসলাম অর্থ শান্তি, নির্জলা সত্যের মাঝেই তার প্রকাশ। নানী দাদীদের উপকথা অন্য ধর্মের কথা হতে পারে, ইসলামের নয়।

"অশিক্ষিত মানুষ ভাল মন্দ শিক্ষা নেয় ধর্ম থেকে।" নাসরিনের ৬৯ পৃষ্ঠায় নির্বাচিত কলামের উপরোক্ত কথাটি অবশ্যই আনন্দেরই কথা। ইসলাম এমনই একটা ধর্ম যেখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল মুসলমানই ইসলাম জানে এবং মানে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হলেও তারা ধর্মকে জানার প্রয়াস চালায় যেটা আর কোন ধর্মে দেখা যায় না। এরা যদি সুশিক্ষিত হতো, শিক্ষার আলো পেতো তবে অন্তত: নিশ্চয়ই আপনাদের মত মন মানসিকতার লোক ইসলামের বারোটা বাজানোর জন্য তৎপর হতে পারতেন না। আর এসব স্বল্পশিক্ষিতদের মনগড়া তথ্য দিয়ে সমাজটাতে ধস্ নামানোর প্রয়াসও করতেন না।

কলেজ পাঠকালীন সময়ে আমরা সহপাঠিরা হোস্টেলে অবসরে ধর্মালোচনা করতাম, এর উদ্দ্যোক্তা আমরা ২/৩ জন মুসলমান মেয়েই ছিলাম। কোনো সাম্প্রদায়িকতা নয়, সর্ব ধর্মের সবাই সবার কথা বলতাম। এখানে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন পক্ষেরই প্রতিনিধিরা থাকতো। দেখা যেত কার্যত: মুসলমান মেয়েরাই ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলছে কিন্তু কোন হিন্দু মেয়ে কোন গল্প বা তথ্যভিত্তিক কথা বলতে পারতো না, আর খৃষ্টান মেয়েদের পক্ষে লুসি গাবিল নামে আমার এক সহপাঠিনী তার ধর্মের অনেক কথাই বলতো। এ রকম ঘটনায় হিন্দু মেয়েরা লজ্জা পেত। ওরা বলতো, "কি জানি বাবা, তোরা জন্মেই ধর্মচর্চা শুরু করে দিস্, আমরা ওসব পারলে শেষ বয়সে মৃত্যুর আগে আরতি, অর্চনা, উপবাস যা পারি করে যাব, এখন এসব আমাদের মাথায় নেই।" শেষ পর্যন্ত উপস্থিত সভার মনোয়ারা নামের আমাদের এক সহপাঠিনী সে রামায়ণ, মহাভারত পড়েছিল। সে হিন্দুদের পক্ষ থেকে ওসব গ্রন্থের কিছু গালগল্প আমাদের শোনাতো। তাছাড়া আমরা আঞ্চলিক কথাবার্তা নিয়েও আলোচনা করতাম। এক এক অঞ্চলের এক এক ভাষা আমাদের দারুণ আনন্দের খোরাক যোগাত।

নাসরিনের ৮৫ পৃষ্ঠাতে লেখা, "ধর্ম নারীকে অমানুষে পরিণত করে, ধর্ম নারীকে করে পুরুষের ক্রিতদাসী।" আবার ১১২ পৃষ্ঠায় "বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহিত, অবিবাহিত ও বিধবা নারীর সজ্জা বিভিন্ন রকম। নারী এয়োতির চিহ্ন বহন করে, হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর, নাকে নোলক, গায়ে গয়না, কাতান বেনারসি পরে নারী প্রমাণ করে সে বিবাহিত। বিধবা বা বিপত্নীক এর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধবার গা থেকে যাবতীয় অলংকার খুলে ফেলতে হবে। বিধবার পরিধেয় বস্ত্র হবে কাফনের মত সাদা, অন্য এক সম্প্রদায়ে বিধবার আমিষ খাওয়ার বিধান নেই, বিধবা মাছ মাংস, ডিম-দুধ খেতে পারবে না। কিন্তু বিপত্নীক পুরুষের জন্য কিছুই বাধা নয়, তাকে নিরাভরণ এবং নিরামিষাশী হতে হয় না।"

উপরের প্রত্যেকটি অপলাপ মুসলিম ছাড়া অন্য অনেক সম্প্রদায়ের ধর্মের অঙ্গ বলে পালন করা হয়। এসব কোন বিধানই ইসলামের অঙ্গ নয়। ইসলামে কোন বিধবা যদি সাদা কাপড় পরে তা তার নিজের অভিরুচী, ধর্মীয় নির্দেশ নয়। বৃটেনের রানীও বিয়ের পোশাকে কফিনের মত সাদা ড্রেস পরে শব সেজে থাকেন। ইসলাম কোন মেয়েকে বিধবা সেজে কৃচ্ছতা পালন করতে বলেনি। প্রয়োজনে ইদ্দত পালন করার পর সে তার গতিশীল জীবনের চিন্তা করতে পারে, নতুন জীবনের জন্য স্বামী নির্বাচন করতে পারে, এ অধিকার তার আছে। ইসলামে বধুকে শাখা, সিঁদুর, গয়না, কাতান, বেনারসি দিয়ে বিবাহিতার প্রদর্শনী করার কোন বিধান নেই। কারো ইচ্ছে হলে কাতান বেনারসি সে পরতে পারে, তাকে আটকাবার কোন শক্তিও কারো নেই। মৌল ইসলাম এক গাদা সংস্কারের জঞ্জাল নয়, ইসলাম চির মুক্ত, চির নবীন, চির সুন্দর ও আধুনিক।

ইসলামে বিয়ে ও তালাক প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা মনে করে ইসলামী সমাজে পুরুষরা ইচছামত চারটি বিয়ে করতে পারে এবং যখন ইচছা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে। অথচ কু'রআনে আল্লাহপাক বলেছেন, "তোমরা যতক্ষণ স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ একের অধিক বিয়ে করবে না।" আয়াতের শেষাংশে বলেছেন যে, "আমি জানি, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না।"

অজ্ঞতার সুযোগে ইসলামকে নিয়ে অনেকেই ব্যবসা করেছে, যার যার মনগড়া তথ্য দিয়ে অনেকেই ইসলামকে কলুষিত করেছে। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত আরব পুরুষরা প্রায়ই ঐ সময় যুদ্ধে নিহত হয়, এতে লক্ষণীয় ঐ সময় পুরুষের স্বল্পতা প্রকট ছিল। ইসলাম সব সময়ই সমতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে এক বিয়েরই পক্ষপাতি। আর অনেক পুরুষরা এ আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজে অনাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছেন সত্য, সে ত্রুটি সমাজেরই ত্রুটি, সমাজের মানুষের ত্রুটি, ইসলামের নয়।

আর তালাক এমন একটি বিধান যাকে অজ্ঞ লোকেরা নির্যাতনের হাতিয়ার বলে চালিয়ে সমাজের পরিবশেকে বিষিয়ে তুলেছে, বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ অভিশাপ দুটোই যেমন কুড়ানো যায়। প্রয়োগকর্তা যদি নিজের খেয়াল খুশি মত এটা দিয়ে হিরোসিমা নাগাসাকিদের উপরে যেমন তান্ডব চালানো হয়, এটি নিশ্চিত এর অপপ্রয়োগই এর হতাশার কারণ। আমরা জানি, আমার আগের আলোচিত মিসেস বিশ্বাসের সমাজ তাকে এরকম একটি বিধান উপহার দিতে পারে নাই বলে আজীবন আপন স্বামীর ঘরে অভিনয় করে তাকে মেকী লোকের স্ত্রী সেজে নাটকের যবনিকার জন্যে অপেক্ষা করে যেতে হয়। এ ছাড়া তার বাঁচার রাস্তা নেই। ইসলাম মুক্ত ও আধুনিক চিন্তার ধারক। সঙ্গত কারণেই এসব ব্যতিক্রমী দৈব দুর্ঘটনায় এটা প্রয়োগ করারই বিধান দেয়া হয়েছে।

তালাক সম্বন্ধে কু'রআনের সুরা বাকারার ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৪ ও ২৩৬ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা আমি নিচে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি।

"তারপর (উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় দুইবার বৈবাহিক চুক্তি নিয়ে তালাক ও পূণর্মিলনের চেষ্টা চালানোর পরেও) যদি সে (তৃতীয়বার) তাকে তালাক দেয় তবে সন্দেহাতীতভবে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এ বিবাহ চুক্তি টিকবে না, তাই) এরপর সে (নারী) তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীকে (ঠিকঠিক) বিবাহ করে। এখন যদি সেই স্বামীও (নতুন স্বামী বাধ্য হয়ে) তাকে তালাক দিয়ে দেয় (অবশ্য হীন ও ঘৃণ্য 'হালালাহ' করার জন্য নয়, তির (৯:২৫) তাহলে (দ্বিতীয় বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রথম জোড়ার যদি জ্ঞানোদয় হয় ও নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করে আবার জুড়ি বাধতে আগ্রহী হয়, তবে কদাচিৎ প্রয়োজন হওয়া এমন বিরল ক্ষেত্রে) তাদের উভয়ের অপরাধ হবে না যদি তারা পরস্পরের কাছে (পুনরায় বৈবাহিক চুক্তিতে) ফিরে আসে, যদি তারা বিবেচনা করে যে তারা (এখন বনিবনাও করে) আল্লাহর গন্ডির মধ্যে (বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখে) থাকতে পারবে। আর এগুলো হচেছ আল্লাহর নির্দেশিত সীমা তিনি সুস্পষ্ট করে দেন সেই লোকদের জন্য যারা (বিধি নিষেধ সম্বন্ধে) জানে" (সুরা বাক্বারাহ ২৩০ আয়াত)।

"আর যখন (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দাও, আর তারা তাদের ইদ্দত (বা অপেক্ষাকাল, ২:২২৮) পূর্ণ করে, তারপর হয় তাদের রাখবে সদয়ভাবে (পুনরায় বিয়ে করে), নয় তাদের (তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে যাবার জন্য ৬৫:১,২) মুক্তি দেবে সদয়ভাবে, তাদের মহরানা ও দেনা পাওনা যথযথভাবে মিটিয়ে দিয়ে, ২:২২৯; ৬০:১০)। আর তাদের আটকে রেখো না (তোমাদের অধীনে ছলচাতুরি বা জবরদস্তি করে) ক্ষতি করার জন্য (তাদের উপর কোনো প্রকার আক্রোশ মেটাতে বা তোমাদের থেকে মুক্তি আদায়ের জন্য মহরানা পরিত্যাগে তাদের বাধ্য করতে। যার ফলে তোমরা (বিধি নিষেধের) সীমা লংঘন করবে; আর যে তাই করে সে নিশ্চয় তার নিজের প্রতি অন্যায় করে। আর (ঝুটমুট তালাক দেয়া, প্রতি তালাকে সালিশীর

ব্যবস্থা না করা, বা "হালালাহ" র ন্যায় মেকী বিবাহ প্রচলনের দ্বারা) আল্লাহর প্রত্যাদেশকে তামাশার বস্তু করে নিও না; আর স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহর নিয়ামত ও তোমাদের কাছে যা তিনি অবতরণ করেছেন কিতাব (কুরআন) ও (তার মধ্যে থাকা) হিকমত (জ্ঞান বিজ্ঞান) সম্পর্কে, যার দ্বারা তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (যাতে তোমরা সব ব্যাপারে সঠিক পথ অবলম্বন করতে পার)। আর আল্লাহকে ভয়ভক্তি করবে, আর জেনে রেখো নিঃসন্দেহ আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞাতা" (সুরা বাক্বারাহ ২৩১ আয়াত)।

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদের (**প্রথম বা দ্বিতীয় দফায়**, ২:২২৯) তালাক দাও, আর তারা তাদের ইদ্দত বা প্রতিক্ষাকাল ২:২২৮) পূর্ণ করে, তখন তাদের বাধা দিও না তাদের (আগেকার) স্বামীদের (সরাসরি) বিয়ে করতে (বা ফ্যাঁকড়া তুলো না তদের হীন ও ঘৃন্য 'হালালাহ'র ন্যায় আগে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে), যদি তারা নিজেদের মধ্যে রাজী হয় সঙ্গতভাবে (পুনরায় সংসার করতে)। এইভাবে এর দ্বারা (অর্থাৎ কুরআনের চিরসুন্দর বানী দ্বারা) উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহতে ও শেষ (বিচারের) দিনে ঈমান আনে। এইটি তোমাদের জন্য (অজ্ঞানতার দিনের হালালাহর চেয়ে) অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতর। আর আল্লাহ (ভালমন্দ সব) জানেন অথচ তোমরা জানো না" (সুরা বাক্বারাহ ২৩২ আয়াত)।

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও রেখে যায় স্ত্রীদের, তারা (স্ত্রীরা) নিজেদের অপেক্ষায় রাখবে চারমাস ও দশ (মৃত স্বামীর প্রতি শোক ও সম্মান দেখানোর জন্যে, আর ইতিমধ্যে গর্ভ হবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা দেখতে, ২:১২৮; ৬৫:৪)। তারপর তারা যখন তাদের সময়ের মোড়ে পৌঁছে যায় তখন তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না যা (বৈবাহিক আলাপ আলোচনা ও সম্বন্ধ) তারা নিজেদের জন্য করে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ ওয়াকিফহাল" (সুরা বাক্বারাহ ২৩৪ আয়াত)।

"তোমাদের অপরাধ হবে না যদি তোমরা তালাক দাও স্ত্রীদের যাদের এখনও তোমরা (সহবাসের জন্য) স্পর্শ করো নি বা দেয় (মহরানা) যাদের জন্য ধার্য করো নি। আর (এহেন অবস্থাতেও) তাদের জন্য (ভরণ পোষণের) ব্যবস্থা করো ধনবানের ক্ষেত্রে তার সামর্থ্য অনুসারে ও অভাবীর ক্ষেত্রে তার সামর্থ অনুসারে (ভরণ পোষণের) ব্যবস্থা হবে পুরোদস্তরভাবে। সৎকর্মীদের জন্য (এটি) একটি কর্তব্য" (সুরা বাকারাহ ২৩৬ আয়াত)।

"কিন্তু যদি তোমরা তাদের তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার আগে এবং ইতিমধ্যে দেয় (মোহরানা) তাদের জন্য ধার্য করে ফেলেছ, (তাদের প্রাপ্য হচ্ছে) যা ধার্য করেছ তার অর্ধেক, যদি না তারা মাফ করে দেয় (তাদের প্রাপ্য অর্ধেকের কোন অংশ) অথবা তারা (স্বামীরা) দাবী মাফ করে দেয় যাদের হাতে রয়েছে বিবাহ গ্রন্থি (আর তাই সম্পূর্ণ মোহরানাই যদি স্ত্রীদের দিয়ে দেয়) আর যদি (স্বামীরা) দাবী ছেড়ে দেয় তবে তা ধর্মপরায়নতার অধিকতর নিকটবর্তী, আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে (দান উপহারের মাধ্যমে) সদয়তা ভুলে যেয়ো না। নিঃসন্দেহ তোমরা যা করো আল্লাহ তার দর্শক" (সুরা বাকারাহ ২৩৮ আয়াত)।

"আমাদের দেশে নামাজ রোজা ধর্মোৎসব ইত্যাদি বেশ ঘটা করে পালন করা হয় কিন্তু ধর্মগ্রন্থ এবং নানা ধর্মীয় পুস্তক সম্পর্কে বিশদ কোনো আলোচনা হয় না, যা হওয়া উচিত। ধর্মচর্চা সঠিকভাবে হলেই দেশশুদ্ধ ধর্মব্যবসার পসার যেমন কমবে, তেমনী ধর্মীয় কুসংস্কারাচছন্ন মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে"। নির্বাচিত কলামের ১৬৯ পৃষ্ঠার উক্ত বক্তব্যটির "ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা হয় না" কথাটি সঠিক নয়। নাসরিনের সাথে আমার আপত্তি আমার ধর্মগ্রন্থ নিয়েই, যা কোন মানুষ লেখেনি, যে গ্রন্থে কোন লেখকের নাম নেই। যে গ্রন্থ দাবী করা হয় ঐশীগ্রন্থ যা স্রষ্টার বা আল্লাহর প্রেরিত। আর অবশ্যই এর চর্চা আরো বেশী বাড়লে সমস্ত মেকি সভ্যতা, কুসংস্কারকে এ পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে বা অন্য কোথাও আশ্রয়

নিতে হবে। এ গ্রন্থের চর্চা বৃদ্ধি হলে আমি নিজেও খুশী হতাম আর সুষ্ঠভাবে চর্চা করলে ভারতের প্রখ্যাত ডক্টর শিবশক্তি সরুপজী মহারাজ ধর্মাচার্য্য আদ্যশক্তিপাঠ এর ন্যায় ইসলাম উদ্দিন (নও মুসলিম হিসাবে নতুন নামকরণ) নাম নিয়ে তার চিরাচরিত জঞ্জালের ভান্ডার ফেলে মুক্তির অন্বেষায় ছুটে আসতো জগতের সমস্ত সর্বহারার দল।

আমাদের রসুল মোহাম্মদ (সঃ) দৃশ্যতঃ কোন বিদ্যাপিঠে বিদ্যালাভ করেন নাই তবে মেধা ও মননে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে জগতে শ্রেষ্ঠত্বের অবদান রেখেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় কোন মানুষ তার শিক্ষক ছিল না। তিনি স্রষ্টা কর্তৃকই শিক্ষিত হয়েছিলেন, এই স্বশিক্ষিত মানুষটি দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয় করেছিলেন তলোয়ার দিয়ে নয়। এই অস্ত্রখানি দিয়ে যা আজকের আলোচ্য বিষয়, তা আল-কু'রআন। নাসরিনের হৃদয় উৎসারিত নানান প্রতিবাদের তোপের মুখে আমিও কোন তলোয়ার নিয়ে আসি নি। আমার হাতেও সেই অস্ত্রখানি যা দিয়ে আমি আপনার শত বঞ্চনার জবাব দেবার আশা পোষণ করছি।

নির্বাচিত কলাম বইটির ১৬৮ পৃষ্ঠায় আপনি নাসরিন বলেছেন, "নারীকে সবচেয়ে বেশী অমার্যাদা করেছে ধর্ম এবং কোন ধর্মই নারীকে মানুষের সম্মান দেয় নি।"

তুলনামূলক ধর্মীয় চর্চা (Comrarative study of religion) যদি আপনি সঠিকভাবে করতেন তবে অবশ্য দিশা আপনার পাবার কথা ছিল। আপনার চর্চাতে গলদ আছে নির্ঘাৎ, নয়তো সত্য মিথ্যা আলো অন্ধকার আপনি বুঝতে পারেন না, নাকি বুঝেও না বুঝার ভান করে থাকেন। অনেক ধর্মেই নারীকে তুচ্ছার্থে ব্যবহার করেছে ঠিকই কিন্তু ইসলামই নারীকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে।

শিশুকালে একটা গল্প শুনেছিলাম দুই পড়শিতে তাদের গরু নিয়ে ঝগড়া লেগেছে। উপায়ান্তর না দেখে দু'জনে ছুটলো এক অল্পশিক্ষিত হুজুরের কাছে। এই হুজুর নামধারী লোকটা ছিল একটা ফটকাবাজ লোক। লোকটা কু'রআনের আয়াত দিয়ে বোকা পড়শিদের বুঝালো 'কু'রআনের ব্যাখ্যা দিয়ে যে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং কু'রআনেই বলেছেন, "হাজা বালাদাল আমিন।" অর্থাৎ এটা আমিন মৌলভীর বলদ। বস্তুতঃ ঐ ফটকাবাজ লোকটার নামও ছিল আমিন। বাস্ বলদটা আমিন মৌলভীর ভাগে পড়লো। আসলে এই আয়াতটা সুরা আত্তীনের তিন নাম্বার আয়াত, এখানে মক্কা নগরীকে নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বালাদ অর্থ নগর কিন্তু এই ফটকাবাজ মৌলভী বালাদকে বলদ বলে চালিয়ে দিল। গল্পের দুই বোকা পড়শি ফিরে গেল। ওই হুজুর নির্ঘাৎ একটা জোচ্চোর ছিল এবং তার অন্তরে কোন খোদাভীতি মোটেও ছিল না। সে ছিল একজন ইসলামের, কু'রআনের শত্রু।

আপনারা অনেকেই যা ধর্ম নয় তাই ধর্ম বলে চালিয়ে দিলেই তো আর সেটা ধর্মের অঙ্গ হবে না। কু'রআনের ব্যাখ্যাকে সঠিকভাবে না নিয়ে নিজেদের মনগড়া তথ্য দিয়ে কুরআনকে গ্রহণ করলে কোনদিনই সত্যের নাগাল পাবেন না। আর কঠিন সত্যকে আহরণ করতে হলে সঠিকভাবে তার চর্চা করতে হবে। যারা কুরআনকে সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করে সঠিকভাবে কু'রআনকে ধারণ করতে পারেনি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে কবি নজরুল গেয়েছেন।

"হায় তোতাপাখি ----
ফল বহিয়াছ, পাও নিক রস, হায়রে ফলের ঝুড়ি
লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাকো নুড়ি"।

সেই নজরুলেরই ভাষায় বলি,

"গাহি সাম্যের গান

বিশ্বে যা কিছু চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী
অর্ধেক তার নর"।

আল্লাহ বলেন---"ভ্রুন পুরুষ বা নারী যাই হোক একটিতে রূপ নেবার পর তাতে রূহ বা আত্মার সঞ্চার হয়"। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "অতপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী"।

নারী মূল্যায়ন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে, শপথ দিবসের যখন তা আবির্ভূত হয় এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন" (সুরা লায়ল ১-৩ আয়াত)।

নারী ও পুরুষ দুজনই মানুষ। সেই মানুষকে আল্লাহ বলেন, "শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি মানুষকে সুঠাম করেছেন, তারপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন" (সুরা শামস ৭-৮ আয়াত)।

চেষ্টা সাধনা, অধ্যয়ন গবেষণার মাধ্যমে মানুষকে ইহকাল ও পরকালীন মুক্তির উপায় আহরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন আল্লাহ "প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে" (সুরা হাশর ১৮ আয়াত)।

"নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দিই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে সে পুরুষ হোক অথবা নারী, তোমরা আসনে এক ও অভিন্ন" (সুরা আল-ইমরানের ১৯৫আয়াত)।

"যে ভালো কাজের সুপারিশ করবে সে তা হতে অংশ পাবে। আর যে খারাপ কাজের সুপারিশ করবে, সেও তা হতে অংশ পাবে" (সুরা নিসার ৮৫ আয়াত)।

উপরের পাঁচ ছয়টা কু'রআনের উদ্ধৃতিতে ইসলামে নারীকে কিরুপ দৃষ্টিতে দেখা হয় তা নিশ্চয় পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। নারী সম্পর্কে অনেকের ভুল ভ্রান্তির প্রতিবাদ স্বরুপ কু'রআনের যে দৃপ্ত অঙ্গিকার তা উপরোক্ত এ সব কটি আয়াতে স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখার যোগ্যতা রাখে।

কোথাও কি মনে হয় নাসরিন, যে স্রষ্টা নিজেও পুরুষ? আপনি আপনার বাবার কথামত আজীবন পড়লেন কিন্তু সত্য উদঘাটন করতে পারলেন না বলে বড়ই আফসোস হয়। তবে আমার বিশ্বাস সত্যিই যদি আপনি "ইকরা" কথাটির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, সত্যের নাগাল আপনি একদিন পেতেও পারেন কারণ আল্লাহর মূলমন্ত্র তো আপনার হাতে আছে, এ মন্ত্রের রহমতে হয়তো বা আপনার এ হতাশায় ভরা জীবন আশার আলো পেতেও পারে। আমরা ইসলামের নারীরা এমনিই মুক্ত। যতটুকু বন্দীত্ব তা আসল নয়, সব মেকী। ইসলামকে গ্রহণ করতে না পারার, না বুঝার গঞ্জনা মাত্র । তাই তো আমাদের মরে মুক্তি পাওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।

ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ঢাকাস্থ ইরানী রাষ্ট্রদূতের পত্নী মাসুমেহ বায়াত সম্প্রতি এক সেমিনারে বাংলাদেশের মজলুম নারীদের উপর এক বক্তব্য রাখেন যার সামান্য সংগ্রহ আমি উল্লেখ করছি। "মানুষের আসল পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব তার আত্মার সাথে, নারী ও পুরুষ আত্মার দিক থেকে অভিন্ন। পার্থক্য শুধু বাহ্যিক গড়ন ও যোগ্যতা। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ, অথচ পাশ্চাত্য নারী ও পুরুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে ঠেলে দিয়েছে।

তিনি বলেন, "পর্দা প্রগতির অন্তরায় নয়। তার অর্থ এও নয় যে, ইসলাম নারীকে ঘরের কোনায় আবদ্ধ রাখতে চায়। পর্দার অর্থ যদি নারীর ঘরের কোনে বসে থাকা হতো তাহলে পর্দার হুকুম ও আল্লাহ দিতেন না। কেন না নারীর ঘরে বসাই বিধান হলে পর্দার হুকুমের কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, তিন বছরের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা হলো এখানকার মুসলিম মহিলারা সত্যিই মজলুম। মজলুম এই অর্থে যে, তাদের ইসলামের সঠিক জ্ঞান দেয়া হয় না যে জন্য তরুণ সমাজ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচেছ।

আল্লাহপাক আমাদের পুরুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। তারা তা না করে বিয়ের পিছনে পড়ে তার জন্য ইসলামের দোহাই পাড়ে।

সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থাকে আমরা মানবদেহে প্রাণ ও মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। উভয়ের সহযোগিতায় মানব জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব। এর একটি অকেজো হলে অপরটিও অচল হতে বাধ্য। আবার প্রাণ ও মস্তিষ্কের মধ্যে একটিকে অপরটির উপর প্রাধাণ্য দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। অনুরুপভাবে উভয়টি একই কাজ করতে গেলেও জীবন অচল হয়ে পড়বে। মানব সমাজে নারীকে মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করলে পুরুষের অবস্থান প্রাণ ও আত্মার মত অথবা পুরুষ মস্তিষ্ক এবং নারী প্রাণ ও আত্মা। উভয়ের গুরুত্ব ও অধিকার সমান কিন্তু দায়িত্ব ও অবস্থান ভিন্ন। তিনি আরো বলেন, "ইসলামের সাথে মুসলিম মহিলার সম্পর্ক মাটির সাথে গাছের সম্পর্কের মত। গাছকে শিকড় উপড়িয়ে মাটি থেকে স্বাধীন ও মুক্ত করতে চাইলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবেই। অনুরুপভাবে মুসলিম মহিলাকে ইসলামী আদর্শ থেকে বিচিছন্ন করার চেষ্টা করা হলে তার অস্তিত্বের দর্শনই বিপন্ন হয়ে পড়বে।"

আল-কুরআনে নারীদের সম্মানে 'নিসা অর্থাৎ নারী' বলে একটা সুরা নাজিল হয়েছে। উক্ত সুরাতে নারীদের ব্যাপারে খুব সুন্দরভাবে বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে। জীবনের সকল সরল ও জটিল অধ্যায় যা সব নারীকেই বাস্তব জীবনে মোকাবেলা করতে হয়।

নিচে নারীর উপর কয়টি কুরআনের উদ্ধৃতি
"তারা স্ত্রীরা তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরাও তাদের অঙ্গাবরণ, তাদের প্রতি তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তোমাদের প্রতিও তাদের তেমনি অধিকার আছে" (সুরা নিসা)।

"আর যে কেউ ভালো ভালো কাজ করে, পুরুষ হোক বা নারী আর সে মুমিন হয়, (কারণ মুমিনরাই আল্লাহর আদেশ নির্দেশ উপদেশ সঠিকভাবে পালন করে থাকে), এরাই তবে বেহেশতে প্রবেশ করবে আর তাদের অন্যায় করা হবে না খেজুর বিচির খোসা পরিমানেও" (সুরা নিসার ১২৪ আয়াত)।

"নিশ্চয়ই (লেভ ১২:২-৫, ২য় ক্রনি ৮:১১, ১ম সামু১৮:২১, এক্লে ৭:২৬ এর বর্ণনানুযায়ী নারী পাপের প্রতীক না হয়ে বরং আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী (২:১১২) এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী (২:১১২) এবং মুমিন পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও মুমিন নারী এবং অনুগত পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ নারী আর অধ্যবসায়ী পুরুষ ও অধ্যবসায়ী নারী, আর বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী আর দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, আর রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, আর নিজেদের আব্রুরক্ষাকারী পুরুষ ও(আব্রু) রক্ষাকারী নারী আর আল্লাহকে বহুলভাবে স্মরণকারী পুরুষ ও (তেমন) স্মরণকারী নারী--- আল্লাহ এদের সকলের জন্য ব্যবস্থা করেছেন (ভুলভ্রান্তি ও পদস্থলন থেকে) পরিত্রাণ ও এক বিরাট প্রতিদান" (সুরা আল-আহযাব: আয়াত ৩৫)।

“যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রেখেছে নিশ্চয়ই বেহেশতই তাহার শান্তিনিকেতন” (সুরা নাজেয়াত ৪০-৪১ আয়াত)।

# ইসলামের ইজ্জত ইরানের নারী

'নারী' নামক এই দুই অক্ষরের একটি বিদ্রোহী সত্তা সমস্ত বইটিতে আলোড়নের ঝড় তুলেছে। কিন্তু অনেক সময় নাসরিনের বইটিতে অনেক উল্টাসিধা বক্তব্যও আছে। তার ১০৭ ও ১১৯ পৃষ্ঠায় নির্বাচিত কলামে এক মুখে দুই কথার প্রকাশ ঘটে। কিছুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশে মহা সারম্ভরে 'মুনির' নামের এক বিকৃত মানসিকতার পুরুষের ফাঁসিতে অপমৃত্যু ঘটে। উল্লেখ্য পরকিয়া প্রেমিক মুনির নিজ স্ত্রী শারমিন রীমাকে ভ্রমণরত অবস্থায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। খুকু নামের একটা নষ্টা মেয়েও এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। যাক্ খুকু যত নষ্টই হোক সে আদালতে রেহাই পায় কিন্তু নষ্ট মুনিরের সেদিন ফাঁসি হয়। সমস্ত জাতি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

বিগত ২৭-৭-৯৩ তারিখের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তসলিমা এ প্রসঙ্গে বলেন, "খুকুর কোন দোষ নেই। সুস্থ স্বামী থাকা অবস্থায় মুনিরের সাথে ছিল, এতে দোষের কি আছে? খুকুই সবচেয়ে বেশী নির্যাতিতা হয়েছে। খুব সক্ষম স্বামী রেখেও যে কোন নারী তার ইচ্ছে যদি হয় প্রেমে পড়বার পড়তে পারে। সমাজ কেন মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ঠেকিয়ে রাখবে" (সাপ্তাহিক পূর্নিমা ৩-১১-৯৩)?

আমি বিস্মিত হই, লেখিকার মুনিরের নিহত স্ত্রীর জন্য বেদনা উপচে পড়লো না, পড়লো সবচেয়ে বেশী সেই নারীর জন্য যে সমাজে বাস করে সমাজের ভালবাসা ভিক্ষা করে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের মতো।

আবার নির্বাচিত কলামের ৯৯ পৃষ্ঠায় নাসরিন একটি সুন্দর গল্প ফাঁদেন-

"এদেশে চিকিৎসকরা সুযোগ পেলে ইরান চলে যান। আমার বেশ ক'জন চিকিৎসক বন্ধু ইরান থেকে ফিরে এসে ওখানকার গল্প বলেছেন। তারা যে কথাটি সবচেয়ে বেশী বলেন তা হলো ইরানী মেয়েরা পা থেকে মাথা অবধি ঢেকে রাখে বটে তবে চিকিৎসকের কাছে অসুখ দেখাতে এসে নিজে থেকেই পুরো কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে ওদের শরীরে বিশেষ কোন অসুখ খুঁজে পান না। ওদের অসুখ আসলে মনে। চার দেয়ালে অবদ্ধ থাকা মেয়েগুলো আসলে বেরুতে চায়, তাই অসুস্থতার ছুতোয় ওরা বেরিয়ে পড়ে। মূলতঃ বের হওয়াই ওদের উদ্দেশ্য। এবং বিদেশী মানুষ পেলে ওরা দেশী নিয়ম ভেঙ্গে মনের অসুখ দূর করে।"

"আমার চিকিৎসক বন্ধুরা ইরানী মেয়েদের শরীরের বড় প্রশংসা করেন। কড়ে আঙ্গুলে ব্যথার কথা বলে পুরো উলঙ্গ হয়ে যাওয়া মেয়েদের গা টিপে টিপে দেখতে হয় আর কোথাও ব্যথা আছে কি না, না হলে ওরা বড় রাগ করে। পরাধীনতা মানুষকে অসুস্থ করে, বিকৃত করে, মন এবং শরীরকে পঙ্গু করে" (১০০ পৃষ্ঠা, নির্বাচিত কলাম)।

লেখিকার স্বপেশার বন্ধুরা বিদেশে ডাক্তারী করার নামে নারীদের নাড়ীটেপার যে গল্প শোনালেন তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। বিশ্ব এখন আর বিশাল নয়। মায়ের কাছে মামার বাড়ীর গল্প লেখিকা ভালই আমাদের শোনালেন। তা আমি ভাবতে পারি না কোন সুস্থ চিকিৎসক কি কড়ে আঙ্গুলে ব্যথার নামে রোগীর কথাতে পুরো শরীর টিপে দিতে রাজি হবে? আর যদি কোন চিকিৎসক রাজি হয় তাকে কি সুস্থ বলা যাবে? আরেকখানি দুঃখ আমার প্রতিপক্ষ লেখিকা যেখানে খুকুর জন্য কুম্ভিরাশ্রু ফেলতে ফেলতে

প্রাণান্তর সেখানে এরকম ঘটনায় এই ইরানী মেয়েটার জন্য একটু চোখের জলও ফেলতে পারলেন না? কেন? ওহ! সে পর্দার ভিতর ছিল বলে, নাকি তার ধারে কাছে ইসলামের গন্ধ ছিল বলে, হয়তো বা।

আমাদের দেশ মুসলিম প্রধান একটি দেশ। এ দেশে কত খুকু কত লিমার জন্ম হচ্ছে যারা জারজ সন্তান দিয়ে দেশটা ছেয়ে দিতে চায় সে রকম একখানা নষ্ট মেয়ে ইরান দেশে পাওয়া গেলে কি সমস্ত ইরান নষ্ট হয়ে যায়! আর আমার বিশ্বাস এ গল্পখানি বিকৃত ডাক্তারদের নিজেদের বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ কারণ উনারা আবার ইরানী মেয়েদের শরীরের বড়ই প্রশংসা করেন। তাছাড়া ইরানী মেয়েরা বন্দী নয়। পর্দা পালন করে বলেই তারা সর্বক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা মতন কাজ করে যাচেছ।

"অসুস্থতার ছুঁতোয় ওরা বেরিয়ে পড়ে।" ইরান সম্বন্ধে লেখিকার ধ্যান ধারণা নেই বলেই এমন সত্যের অপলাপ মিশ্রিত কথা তিনি বলতে পেরেছেন। নাসরিন, আপনার দৃষ্টিতে নষ্ট ইরান আসলেই কি নষ্ট? ইরানের কিছু তথ্য নিচে দিলাম, পাঠক আপনারাই বিচার করবেন-

ইসলামী সংস্কৃতি ও নারীর সামাজিক মর্যাদার উপর ইমাম এর নেতৃত্বের প্রভাব ছিল অসাধারণ। ইরানে মহিলাদের মর্যাদা সংরক্ষিত হবার পর মহিলারা সর্বোচচ সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচেছ। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ৩, ২১, ২৮, ৪৩ ধারায় নারীর সম্মান ও মর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই সংবিধান বলে ইরানের পুরুষের মত নারীরাও সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। সম্পূর্ণ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ইরানে মহিলাদের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ছোঁয়ায় ইরানের নারী সমাজ বিশ্বের মুসলিম নারী সমাজের আদর্শ হিসাবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে।

হযরত ফাতেমা জোহরা এর আদর্শ ও অনুপ্রেরণা ইসলামী বিপ্লব বিজয়ে ইরানী নারীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। শুধু ইরানে নয়, সারা বিশ্বের নারী সমাজের আদর্শ হিসাবে হযরত ফাতেমা জোহরা এর আদর্শ অনুপম। একজন নারী হিসাবে এবং সর্বগুণে গুণান্বিতা একজন মানুষ হিসাবে হযরত ফাতেমা জোহরা ছিলেন অতুলনীয়া। খোদার বিশেষ অনুগ্রহ লাভে তিনি ধন্য ছিলেন। তিনি স্বয়ং মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন।

ইমাম খোমেনী (রাঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহন যেমন---পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, মরমীবাদ ও তাফসীর এসব বিষয়ের শিক্ষা লাভের উপরই মুসলিম নারীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিকায় জোর দেওয়া হয়। পরিবারে নারীর আদর্শ মা ও স্ত্রীর ভূমিকা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভূমিকার বিরোধী নয়, বরং সহায়ক। পরিবারের আদর্শ মা, স্ত্রীই পারে সমাজে আদর্শ নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। তাই ইরানী পরিবারে নারীদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী বিপ্লবে নারীদের সাহস, আত্মত্যাগ, ধার্মিকতা, দৃঢ় প্রত্যয় ছিল অসাধারণ। পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইরানের নারীরা ইসলামী বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। ইরানে উৎপাদন, বন্টন, ব্যবহার ও ব্যবসায়ে মুসলিম নারীর অধিকার রয়েছে। তারা ইচছা করলে পুরুষদের মত ব্যবসা বানিজ্যও করতে পারে। বিভিন্ন শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের মালিক হবার অধিকার রয়েছে। মোট কথা, মুসলিম সমাজে নারীদের পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে।

মেয়েদের অর্থ উপার্জনের মানে এই নয় যে, পরিবারের ভরন-পোষণের দায়িত্ব তাদের। মেয়েরা যে অর্থ উপার্জন করবে তা তাদের নিজস্ব। সেই অর্থ স্বাধীনভাবে খরচ করার অধিকার তার রয়েছে। এই অর্থ

পরিবারের জন্য খরচ করতে সে বাধ্য নয়। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাচছন্দ্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী পুরুষের সহযোগিতা জাতীয় সুখ ও সমৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইরানের নেতা নিম্নলিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে নারী স্বাধীনতার ব্যাখ্যা উপস্থাপনা করেছেন।

(১) ইসলাম ও নারী স্বাধীনতার সমন্বয়।

(২) নারী স্বাধীনতার মূল উৎস হলো ইসলাম। মানব ইতিহাসে নারী স্বাধীনতার প্রতি ইসলামের যে অবদান তার কোন তুলনা নেই। ইসলামে নারী জাতিকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(৩) মানব ইতিহাসে নারী মুক্তির একমাত্র সহায়ক মতাদর্শ হলো ইসলাম।

(৪) অভিভাবকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের চেয়ে নারীর মর্যাদা।

(৫) সমাজে শিক্ষিত নারীর অবস্থান।

(৬) ইসলাম পুরুষের চেয়ে নারীকে বেশী মর্যাদা দিয়েছে; তাদের অধিকার বেশী স্বীকার করেছে। নারীরও ভোটাধিকার রয়েছে। ব্যবসা বানিজ্যেও তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তারা যেমন নির্বাচন করতে পারে তেমনি নির্বাচিত হতে পারে। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই কর্তৃত্বের অধিকার দিয়েছে। নারী পুরুষের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে তা প্রাকৃতিক কারণে। ইসলাম নারীদের যেসব স্বাধীনতায় বাধা দেয় তার ফলে আসলে নারী অনৈতিকতা ও যৌন অপরাধ থেকে মুক্তি পায়। এভাবে ইসলাম নারী জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

## পাশ্চাত্যে নারী:

পাশ্চাত্যে নারীদেরকে পুরুষের মত সমান অধিকার দিতে গিয়ে আসলে নারীকে মর্যাদাহীন করে তাকে নিছক প্রদর্শনী ও ভোগ্যপন্যে পরিণত করা হয়েছে। অথচ নারীও সম্মানিত মানুষ। তাদেরও মর্যাদা লাভের অধিকার রয়েছে। পাশ্চাত্যের এই বর্ধিত বস্তুবাদিতা এবং জোরালো আত্মকেন্দ্রিক অহংবোধের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাদের কাছে স্বামী ও সন্তানদের স্থান হচ্ছে খুব কম এবং কখনো একেবারেই হচ্ছে না। শিশুদের লালন পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সময় দরকার এবং এব্যাপারে সুফল ও সাফল্য পাওয়া যায় দীর্ঘকাল পরে। এর অর্থ সন্তান লালন পালনের ধৈর্য ও সহনশীলতা আবশ্যক। পশ্চিমা সমাজে এই ধৈর্য কোন জোরালো উপাদান নয়, সেখানে যা জোরালো তা হলো মহিলাদের ব্যক্তিত্ব এবং রুঢ় অর্থে অহংবোধ। এর ফলে পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে গেছে এবং পরিবারে পুরুষের ভূমিকায় ধস নেমেছে।

ইউরোপীয় মহিলাদের মধ্যে এখন খুব হালকা মানসিকতার বিস্তার ঘটছে। কেন না, পশ্চিমা সমাজে বহু রকমের হালকা ও অর্থহীন ব্যাপারে মহিলাদের ব্যস্ততা ও অনুশীলনের দরুণ তাদের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও সংকট সমাধানোপযোগী মানসিকতা গড়ে উঠছে না। যা কিছু তাদের কাছে আধুনিক ও নতুন মনে হয়, সেটিই তাদের কাছে চমৎকার মনে হয়। এমন কি তা কোন যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় না হলেও। যেমন: কুকুর, গাড়ী, ও চিত্রতারকাদের প্রতি আকর্ষণ। একদল স্বার্থপর পশ্চিমা মহিলা সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে পুরুষের সাথে সম্পর্ক কামনা করলেও স্বামী গ্রহণের ধারনা নাকচ করে দিয়েছে। কেন না তারা মনে করে সন্তান হলো পুতুলের মত এবং তার মালিক কেবল তারাই। এখানে স্বামী বা সন্তানের পিতা হিসাবে কারো উপস্থিতি থাকলে সে সন্তানের অংশীদারিত্ব দাবী করবে আবশ্যিকভাবে। এই নীতি

অনুশীলনের মাধ্যমে তারা পিতাদের সন্তানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং সন্তানকে বঞ্চিত করছে পিতৃস্নেহ ও অধিকার থেকে। উভয়ের প্রতিই এ এক বিরাট বে-ইনসাফী।

৮৫শতাংশ আমেরিকান মনে করে তারা খৃষ্টান। বাস্তবে কিন্তু খুব কমই ধর্মানুসারী পাওয়া যাবে। কিছু খৃষ্টান দাবী করে যে খৃষ্টধর্মের শিক্ষা অনুসারে সকল মানুষের জীবন পবিত্র এবং গর্ভপাত হত্যাকান্ডের শামিল। অন্যরা মনে করে খৃষ্টধর্মে নারীর অধিকারের সম্মান জানানো হয়েছে। নারী তার নিজ শরীরকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিছু লোক মনে করে খৃষ্টধর্ম সমকামিতার বিরোধী, আর কিছু লোক মনে করে সমকামিতায় কোন দোষ নেই। এরা সমকামিদের বিবাহ উৎসব পালন করে থাকে। পাশ্চাত্যে ইহুদী ধর্মের অবস্থা তদ্রূপ। এদের কেউ কেউ চরম উদার নীতিবাদে বিশ্বাসী। আবার কেউ কেউ নানা রকম আচার অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে দুর্নীতি সন্ত্রাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাচেছ। সরকারী নীতি বলছে যে, এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী বাহিনীর অভাব। কিন্তু নৈতিক বিপর্যয় যে মারাত্মক আকার ধারন করেছে তা সকলেই স্বীকার করছে। কিছু কিছু বুদ্ধিজীবি মত প্রকাশ করছেন যে, এই নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হলো উদার নৈতিক মতাদর্শ। কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক, দার্শনিক, উদারনৈতিক দর্শনের বিরুদ্ধে বই পুস্তকও রচনা করেছেন। ম্যাকিনটায়ার তার গ্রন্থে ধর্মের প্রতি প্রত্যাবর্তনের আহবান জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র তার নাগরিকদের নৈতিক মূল্যবোধ উপস্থাপনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এই সমাজ নিদারুণভাবে হতাশাগ্রস্থ। দেশের উদারনৈতিক ভিত্তি সমাজের এই ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় নৈতিক নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। তারপরও আশা করার কারণ রয়েছে। অপরাধ ও অনৈতিকতার সমস্যা যতই প্রকট হয়ে উঠছে ততই জনগন উদারনীতিবাদের অসারতা বুঝতে পারছে। জনগন এখন নতুন মূল্যবোধের সন্ধান করছে। মানুষ ধর্মের প্রতি আবারো মুখ ফেরাচেছ, বিভিন্ন ধর্মীয় বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রাচ্যদেশীয় ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রতিও মানুষের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। অনেক আমেরিকানের মন এখন আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জন্য আকুলি বিকুলি করছে। ইসলাম ধর্মের প্রতিও মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। এখন আমেরিকানদের জন্য সময় এসেছে ইসলামের কৃতিত্ব সমূহের প্রতি নজর দেওয়া, ইসলামকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করা।

# অনেকের চোখে

তসলিমা নাসরিন সম্বন্ধে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, আহমদ সফা বলেন, "তসলিমার লেখা ইতর শ্রেণীর রচনা, ভদ্রলোকের স্পর্শের অযোগ্য। লেখিকা হিসাবে তসলিমা কিছুই না। কেউ কেউ তাকে বড় লেখিকা বলে, এমন কি বেগম রোকেয়ার সাথে তুলনা করে, তাদের এ সার্টিফিকেট দেখে আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে জানেন না, তার মনে হবে বেগম রোকেয়া মাসে মাসে স্বামী বদলাতেন।

গুলশান আখতার দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক সাপ্তাহিক সুগন্ধায় ৫-১১-৯৩ তে উক্ত লেখিকা সম্পর্কে বলেন, "তসলিমা নাসরিনের লেখাকে প্রায়ই মনে হয় চটকদার, এমনকি কখনো কখনো রীতিমত অশ্লীল। একজন সচেতন লেখকের অবশ্যই তার দেশ, জাতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার।"

"মানুষের সকল জন্মই বৈধ, কোন সন্তানই অবৈধ নয়, কুমারী নারীর গর্ভে সন্তান ধারণ বৈধ নয়, পুরুষের তৈরী এ নিয়মের শৃংখলে বন্দী প্রতিটি নারীর জরায়ু---"। উক্ত উদ্ধৃতিটুকু তসলিমা তার নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য এর ৩৫, ৩৬ পৃষ্ঠায় জারজ সন্তানের পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতী করেছেন।

তসলিমা তার লজ্জা উপন্যাসের নায়ক সুরঞ্জনকে দিয়ে একটি মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করালেন, তারপর সুরঞ্জন শান্তি পেল। নায়ক বলছে, "শালার বাংলাদেশে কুত্তার দেশে আর থাকবো না।" এ অংশটুকু কোন লাঞ্ছিত হিন্দুর বক্তব্য নয়। এ এক মুসলিম নামধারী মুসলিম বিদ্বেষী নাসরিনের প্রলাপ মাত্র।

ভারতের দুটি পত্রিকায় বলা হয়েছে যে বি, জে, পি তসলিমা নাসরিনকে লজ্জা উপন্যাস লেখার জন্য ইতিমধ্যে ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে। তসলিমা কলকাতার সল্ট লেকে বাড়ী কেনার জন্যে সেখানে পরিচিতদের বাড়ী খুঁজতে বলেছেন। ইতিমধ্যে তিনি ঢাকাতে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি ফ্লাট কিনেছেন (দৈনিক ইনকিলাব ২৯-১০-৯৩ প্রকাশিত)।

"লেখিকা তসলিমা নাসরিনের চোখে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর, বাংলাদেশ হলো শালা শুয়োরের বাচচা।" (সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ৩-১১-৯৩)।

সাম্প্রদায়িকতা ও যৌনতার সংমিশ্রণে লিখিত তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' ইতিমধ্যে সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। এতে বিজেপির আদেশে তসলিমার বক্তব্য, "মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং খুন হয়েছে। এদের বাড়ীঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের কিছুই হয় নি, মুসলমানরা হিন্দুদের সাহায্যে এগিয়েও আসে নি"--- এ ধরণের উক্তি করে তিনি স্বাধীনতাকে এবং মুক্তযুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন (ইনকিলাব ২৯-১০-৯৩)।

১৯৭৭/৭৮ সালের দিকে তসলিমা নাসরিন নামটি প্রথম দেখা যায় সাপ্তাহিক চিত্রালীর পাতায়। সে সময়ের তরুণ কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লার সাথে প্রেমে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তার উশৃংখল ও বেহায়াপনা জীবন যাপনের কারণে রুদ্রের সাথে তার বিবাহ বিচেছদ ঘটে। এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি স্বামী বদল করেছেন তিনবার (সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ৩-১১-৯৩)।

"প্রথম স্বামী রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (মরহুম), দ্বিতীয় স্বামী বিচিন্তার সম্পাদক মিনার মাহমুদ, তৃতীয় স্বামী আজকের কাগজের সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান। বর্তমানে তসলিমা নাসরিন ঢাকায় একজন

তরুণ প্রকাশকের সঙ্গে "লিভ টুগেদার" করছেন, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম (নিষিদ্ধ) (সাপ্তাহিক সুগন্ধা ৫-১১-৯৩)।

অতি সম্প্রতি দাউদ হায়দার নামক আরেক পলাতক আসামীর সাথে উনি আবার জুটি বেঁধেছেন। তার বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক। জীবনে এতোটা যে এসেছেন, সবই পুরুষের হাত ধরে।

এছাড়াও তার প্রায় সকল বইপত্র যেমন নিমন্ত্রণ, লজ্জা, নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য, ভ্রমর কইও গিয়া, শোধ, অপরপক্ষ, নির্বাচিত কলাম, যাব না কেন যাব, বেহুলা, একা ভাসিয়েছিল ভেলা ইত্যাদি বইতে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ধর্মদ্রোহীতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ভারতের স্বপক্ষে নির্লজ্জ দালালী করে গেছেন।

ভারত এমনই একটা রাষ্ট্র যেখানে প্রায় সারা বছরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে থাকে। ভিন্ন সম্প্রদায় ছাড়াও সে সমাজে উচচ বর্ণের সাথে নিম্ন বর্ণের সাপে নেউলে সম্পর্ক। এমতাবস্থায় মানবতার শত্রু এ নারী এমনই কর্মকান্ড চালিয়ে গেছেন যাতে ভারতের সাম্প্রদায়িক অঙ্গনের আগুন অগণিত বছর দাউ দাউ করে জ্বলতেই থাকে। বাংলাদেশের হিন্দুরাই ভাল বলতে পারবেন বাংলাদেশে আমরা হিন্দু মুসলিমরা কেমন আছি। আমার পূর্ব পুরুষ ভারতের অধিবাসী। আমার জন্ম শিলং শহরের রবার্ট হসপিটালে, যদিও আমি শিশুকাল থেকেই বাংলাদেশের সন্তান হয়েই বেড়ে উঠেছি।

১৯৮৩ সালের দিকে আমি আমার আব্বার সাথে ভারতে আমার দুই বাচচাসহ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে ভারতের এক নিমন্ত্রিত জলসায় আমার মামার সাথে আমার আব্বাও গিয়েছিলেন। বাংলাদেশী হিসাবে আমার আব্বাও ছোট্ট একটা বক্তব্য রাখেন। উপসংহারে ওখানের মোড়লরা এ কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করলেন যে, আপনাদের দেশের মত সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত পরিবেশ আমরা এদেশে গড়তে পারি নি বলে আমরা বড়ই লজ্জিত। এ শুধু আমার এই বক্তব্যটুকুই নয়, চোখ কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখুন আর সত্য যাচাই করুন।

এখানে আমি ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করতে বাধ্য হচিছ। এই নীতির প্রবক্তা ছিলেন আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বদরে। মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম মুজাহিদকে সাথে নিয়ে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে নবী (সঃ) মুসলিম মুজাহিদের যুদ্ধের নীতি ও কৌশলের ব্যাপারে শিক্ষা দেন। তিনি তার মুখপাত্র হিসাবে চাচা হযরত আমির হামজাকে যুদ্ধের ইসলামী নীতিমালা ঘোষণার দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুজাহিদদের প্রতি মহানবীর নির্দেশ ছিল আল্লাহর জন্য আমৃত্যু লড়াই করে যেতে হবে। লড়াইয়ে জয়ী হলে গাজী এবং মারা গেলে হবে শহীদ। মুজাহিদদের প্রতি মহানবী(সঃ) এর আরো নির্দেশ ছিল আহত শত্রুদের হত্যা করা বা অত্যাচার করা যাবে না। অসহায় নারী ও শিশুদের হত্যা ও নির্যাতন করা যাবে না, ইত্যাদি।

ইসলামের এই যুদ্ধনীতি পরবর্তীকালের বিশ্বে একটি আদর্শ হয়ে আছে। এই নীতিমালা আল-কুরআনেও বর্ণিত আছে। এই কুরআনীয় নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই ইসলামের সামরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে, যে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলো:

(১) কারো আক্রমণ প্রতিহত করা।
(২) অন্যায়ের প্রতিরোধে যুদ্ধ করা।
(৩) পৃথিবীর বুকে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।
(৪) জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দুর্বল ও অসহায়কে সাহায্য করা।
(৫) যুদ্ধকালে শত্রুর প্রতি অমানবিক আচরণ না করা।

(৬) যুদ্ধকালে অসহায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধাদের হত্যা না করা।
(৭) অযথা সম্পদ ধ্বংস না করা।
(৮) বন্দীদের সাথে সদয় আচরণ করা।
(৯) কোন চুক্তি হলে সেই চুক্তি রক্ষা করা।
(১০) নিজেদের অধীনস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা ইত্যাদি।

ইসলামের সামরিক সংস্কৃতির এই ঔদার্য পৃথিবীর অন্য কোন জাতির সমরনীতিতে দেখা যায় না। ইসলামের এই আদর্শের ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী শত শত বছর ধরে পশ্চিমে মাগরেব (মরোক্কো) থেকে স্পেন, পূর্বে চীন পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেছে। ইসলামী আদর্শের কারণে মুসলিম বাহিনী তাদের বিজিত এলাকায় কোন উপনিবেশ স্থাপন করেনি বা ত্রাসের রাজত্বও কায়েম করে নি বরং স্থানীয় জনগণ মুসলিম বাহিনীর অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে গেছে, নিজেদের দেশে মুসলিম বাহিনীকে সাদরে গ্রহণ করছে। মুসলমানদের শত্রু মনে না করে আপন মনে করেছে।

ইসলাম কখনো জবরদস্তি শাসন কায়েম করে নি বা জোরপূর্বক বিধর্মীদেরকে মুসলমান বানায়নি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বর্তমানের ভারত এবং স্পেন। এ দু'টি দেশে শত শত বছর ধরে ইসলামী শাসন কায়েম ছিল। তারপরও দেশ দুটিতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সামরিক সংস্কৃতি অন্য জাতিদের উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়নি।

নাসরিন তার লেখাতে বারে বারে সত্যের অপলাপ করেছেন। পুরুষের কলঙ্ক ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে বারে বারে পুরুষের গলায় মালাবদল করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এমনও পতন তাঁর হলো একজন পুরুষকে তিনি ঈশ্বরও বলতে পারলেন। অংশীবাদীরা এমনিতেই তো আল্লাহর নবীকেও ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে। কৃষ্ণও পেয়েছেন ঈশ্বরত্বের সম্মান কিন্তু জানা যায় কিছু ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ ছিলেন নিরাকার ঈশ্বরের পূজক।

নাসরিন তার নির্বাচিত কলামে বলেন, "পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের টাকাকড়ি লুট করেছে, যাবার আগে পুড়িয়ে দিয়েছে বাড়ী, আমার বাবাকে ধরে নিয়ে বুট ও বেয়নেটে পিষেছে, দুই কাকাকে গুলি করে ফেলে রেখেছে রাস্তার মোড়ে, আমার ভাই এর ডানচোখ উপড়ে নিয়ে গেছে, এই মাসে মুক্তি যুদ্ধে যাওয়া তিন মামার দুজন ফিরে এসেছে। ষোল দিন পর ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছে আমার একুশ বছরের বয়সের খালা। পড়শি যারা যুদ্ধ করেছে, কারো হাত নেই কারো পা।"

উপরোক্ত মন্তব্য কি প্রমাণ করে না যে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি? তাহলে নাসরিন আপনার চৌদ্দপুরুষ কি কেউই মুসলমান ছিল না নাকি শুধু নামেই তসলিম, আর কাজে সবাই ফানুস?

একটি মুক্তিযুদ্ধ শুধু যোদ্ধারাই করে নি, এদেশের অগনিত ছাত্র, যুবক, চাষা-ভূষা অস্ত্র হাতে নিয়েছিল; আর যারা এদেশে যুদ্ধের ময়দানে ছিল এরা কি সৈনিক থেকে কম অবদান রেখেছিল? যারাও বা পাকিস্তানপন্থী ছিল তাদেরকেও পাঞ্জাবীরা 'দোস্ত' ভাবে নাই। তারা পুরা যুদ্ধের ময়দানে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রত্যেকটি বাংলাদেশীই ছিল তাদের কাছে মুক্তিযোদ্ধা।

"সংসারের সাধ আমার বহু দিনের। বড় হয়ে যখন সত্যিকারের সংসার করতে চাইলাম, তখন আমার স্বপ্নকে অল্প অল্প করে পল্লবিত করলাম। তখন আমি বুঝিনি, যে মানুষটি আমার সঙ্গে ছিল সে ছিল মূলতঃ প্রতারক। সে আমার স্বপ্নের একবিন্দু কিছু বুঝেনি। কেবল শরীর ভরে মেয়ে মানুষের মাংস চেয়েছে, বাস। কোন পুরুষ আমাকে সংসার দেয় নি। দশটা পাঁচটা চাকরি করে যে ঘরে এসে ঢুকি সে ঘর আমার

ঘর। আমার নিজের হাতে গড়া আমার বসবার ঘর, শোবার ঘর, বারান্দা। --- কোন প্রতারক পুরুষের কাছে সংসারের অপেক্ষায় আমি বসে থাকিনি। স্বপ্নের ভাঙ্গন নিয়ে হা পিত্যেস করিনি। কে বলে মেয়েরা পারে না একা বেঁচে থাকতে, একা দাঁড়াতে? আমার সর্বস্ব লুটে আমাকে নিঃস্ব করে যখন প্রতারক পুরুষরা যে যার মত করে পালিয়ে গেছে কই আমি তো ধূলো ঝেড়ে ঠিক দাঁড়িয়েছি।" ৯০ পৃষ্ঠায় 'নির্বাচিত কলামে' প্রথম স্বপ্নের সংসার ভাঙ্গার শব্দ পেলাম।

আবার ১২৪ পৃষ্ঠায় এই স্বাধীনচেতা লেখিকার দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ---"আমি একথা খুব স্পষ্ট করেই জানি যে এই শহরে আমার যোগ্য একটি পুরুষও নেই। যে পুরুষের দিকে আমি তাকাই, কোন না কোন দিক থেকেই তারা আমার তুলনায় তুচ্ছ, অপকৃষ্ট। এই শহরে একটি পুরুষও নেই যার করতলে আমি দ্বিধাহীন রাখতে পারি আমার বিশ্বাসের সব ক'টি আঙ্গুল। এই শহরে একটি সামান্য পুরুষও নেই যাকে আমি হৃদয়ের শিকড় বাকড় উপড়ে বলতে পারি 'ভালবাসি'। এই শহরে আমার প্রতিভা ধারণ করার যোগ্যতা কোন পুরুষের নেই। আমার মেধা ও মননের অগাধ সৌন্দর্য গ্রহণ করার শক্তি নেই কারো। আমার বোধের নাগাল পাবার মত দীর্ঘ বাহু কারো নেই। আমার স্বাধীনতা ছুতে পারে এমন সাহস আমি কারো দেখি না। আমাকে ভালোবাসবার দুঃসাহস যেনো কোন কাপুরুষের  না হয়" (১২৪ পৃষ্ঠা, নির্বাচিত কলাম)।

"রূদ্র আমায় স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। আমি কেবল নদীই দেখেছি, সেই আমাকে উত্থাল সমুদ্র যেমন দেখিয়েছে, ঘোলা জলাশয়ও কিছু কম দেখায় নি। রুদ্র আমাকে পূর্ণিমা দেখিয়েছে জানি, অমাবস্যাও কিছু কম নয়। তাকে আমি অনিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে শেষ অব্দি ফেরাতে পারি নি, নিরন্তর স্থলন থেকে, স্বেচছাচার থেকে, অবাধ অসুখ থেকে আমি তাকে ফেরাতে পারি নি। তার প্রতি ভালবাসা যেমন ছিল আমার, প্রচন্ড ক্ষোভও ছিল তাই। যৌথ জীবন আমরা যাপন করতে পারি নি, কিন্তু যত দূরেই থাকি, আমরা পরস্পরের কল্যাণকামী ছিলাম। রুদ্রর সামান্য স্থলন আমি একদিনও মেনে নেই নি, রুদ্রর দু'চারটে অন্যায়ের সঙ্গে আমি আপোস করিনি। পরে সময়ের স্রোতে ভেসে আরো জীবন ছেনে, জীবন ঘেটে আমি দেখেছি রুদ্র অনেকের চেয়ে অনেক বড় ছিল, বড় ছিল হৃদয়ে, বিশ্বাসে। রুদ্রর ঔদার্য, রুদ্রর প্রাণময়তা, রুদ্রর অকৃত্রিমতার সামনে যে কারুকে দাঁড় করানো যায় না।"

"রুদ্র নিশ্চয় আসবে, হঠাৎ একদিন ফিরে আসবে। টি, এস, সিতে দাঁড়িয়ে চা খাবে। লাইব্রেরির মাঠে বসে আড্ডা দেবে, বিকেলে অসীমদার প্রেসে সকলকে অবাক করে দিয়ে রুদ্র বলবে, বাড়ী গিয়েছিলাম, এই এলাম। রুদ্র তবু ফিরে আসুক। এক বছর, দু'বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর পর হলেও রুদ্র ফিরে আাসুক। রুদ্র তার অসুস্থতার মত মৃত্যুকেও অতিক্রম করে সত্যিকার ফিরে আসুক----" (১৭৯ পৃষ্ঠা, নির্বাচিত কলাম)।

"পিতার ঘরে চলে স্বামীর সংসারে যাবার নিরলস প্রশিক্ষণ এবং স্বামীর সংসারে স্বামীর মুখের একটি কথা তিনবার উচচারিত হলেই ঘর ভেঙ্গে যায়। সেই পিতা এবং স্বামীর ঘর কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, নিশ্চিত বসবাসযোগ্য নয়" (৪৭ পৃষ্ঠা, নির্বাচিত কলাম)।

সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও সহমর্মিতা না থাকলে কোনো কঠিন কাজই সহজে করা যায় না। আর সংসার করা আর নাটক করা এক কথা নয়। বাস্তব বড়ই কঠিন রুঢ়। মেকি আদর্শ দিয়ে জীবন গড়া বড়ই কঠিন কাজ। তাইতো নাসরিনের কাছে রুদ্র কখনো প্রতারক, কখনো মাংসলোভী পিশাচ। আবার সেই রুদ্রই কখনো বা স্বপ্নময় বিলাস।

কঠিন জীবনধর্মী আদর্শ অনেক হতাশার মাঝেও আলো জ্বালাতে পারে। মৃত্যু পথযাত্রী আত্মহন্তার কাছ থেকে বিষের পাত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাকে জীবনে বাঁচার দিশা দিতে পারে। শুধু মাত্র মৃত্যু, শুধু মাত্র আত্মহত্যা ব্যর্থতার নামান্তর। তবে মেকি বুলি আর মেকি আদর্শ নাসরিনের পরম পূজিত লেনিনের মতই মুখ থুবড়ে পড়বে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। অনিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে ফেরাতে হলে আদর্শ বজ্রমুষ্টি হাতের প্রয়োজন, এসব উল্টাসিধা আদর্শ দিয়ে স্থায়ী সত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। রুদ্রের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে নাসরিনের মেকি আদর্শকে হার মানতে হয়েছে যার জন্য সম্ভবতঃ যৌথ জীবন যাপন সম্ভব হয়নি। শেষের দিকে আবার সেই প্রতারকের জন্য কি না মায়াকান্না! এবার দেখা যায়, রুদ্র মহান, রুদ্র অনেকের চেয়ে বড় ছিল কারণ রুদ্রকে আর এরকম নারীর হাতে ছলনার জীবন কাটাতে হবে না, রুদ্র মরে বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ নাসরিনের জন্মান্তরবাদের–

আবার আসিব ফিরে
হয়তো মানুষ নয়
শঙ্কচিল শালিকের বেশে।

ফিরে আসার সাধ আর রুদ্রের থাকার কথা নয়। এ জীবনে সম্ভবতঃ রুদ্রেরও ঘোলা জলাশয় অনেক দেখা হয়েছে। তাইতো সবার জন্যে বিস্ময় রেখে কোনো রোগই রুদ্রকে রুগ্ন করে নি, রুদ্র সকল অসুস্থতা আড়াল করে অমলিন হেসেছে।

বেগম রোকেয়াও তার প্রতিবাদী মন নিয়ে আজীবন নারীবাদী হিসাবে কাজ করে গেছেন। কিন্তু তাই বলে মানুষকে অপমান করে নয়। স্বামীর সম্মান তার সম্মান কমায়নি। আদর্শ ছাড়া কোন জিনিসই প্রস্ফুটিত হয় না, স্থায়িত্ব পায়না। একটি পত্রিকার খবরে প্রকাশ, নাসরিনের উক্তি---"আমার খুব দুঃখ হয় রাস্তার মোড়ে মোড়ে কেবল মসজিদ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মন্দির দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

মোড়লীপনার নামে মন্দির মসজিদের দালালী করতে এসে সমস্ত সাহিত্য অঙ্গন ভরে যে চন্ডাল নৃত্য গেয়ে গেলেন তার জন্য আপনাকে কি বলে যে সম্মোধন করবো তার আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সংকীর্ণতা ছেড়ে উদারতার দিকে হাত বাড়ান। মনকে প্রশস্ত করুন। পৃথিবীকে মানুষের যোগ্য আবাস হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালান। আর দানবনৃত্য নয়, সত্য ও সুন্দরের সাধনা করুন।

মাত্র আজকের পত্রিকা 'জনকণ্ঠ' ১লা বৈশাখ বাংলা ১৪০৩ (১৪-৪-৯৬ ইং) পেপার পড়ছিলাম। হঠাৎ বেশ বড় একটা কলামে একটি খবর আমার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করলো।

## ভারতে মিশ্র বিয়ের প্রস্তাব :

ভারত যদিও একটি ধর্ম নিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জনসাধারণের মধ্যে সত্যিকার কোন সংহতি কিন্তু রচিত হয়নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে। এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক সম্প্রদায়ের বিয়েতে উৎসাহ যুগিয়ে, এ ধরণের দম্পতিকে পুরষ্কার প্রদান করে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে একটি শুভ সূচনা করা যায়। (নয়াদিল্লী থেকে জওয়াহর খান্নার লেখা চিঠি, ইন্ডিয়া টুডে, ৯৬ সাল)।

বাহ! অতি উত্তম প্রস্তাব। ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে যে দেশে সারাবছর ধর্ম নিয়ে তান্ডব ব্যবসা চলে, তারা এখন ভালই সম্প্রীতির ব্যবস্থা করছে। সমাজ ব্যবস্থার হাজারো বঞ্চনা হাজারো নির্যাতনের কারণে হাজারে হাজারে অবিবাহিত মেয়েরা ছেলেরা আজ দিশাহারা বিভ্রান্তির শিকার। নিজেদের যখন বারোটা বেজেছেই দেখা যাক ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর চৌদ্দটা বাজানো যায় কি না? অচ্ছুৎদের সমাজে তুলে নিলেই তো হয়। শুদ্র, শুদ্রানীদেরে মানুষ বলে ডাকলেও তো হয়। আমার মনে হচ্ছে সামনে এমন একটা সময় আসছে বুঝি বা ইসলামই ভারতবাসীকে মুক্তি দিতে পারবে। সমস্ত বঞ্চিত নিপিড়ীত নিজ নিজ নিপিড়ীত ধর্মে পড়ে মার খাবে কেন? যেথায় পিপাসার্ত জল পাবে, যেথায় ছায়া প্রখর রোদ্র পিড়ীত পথিক সেথায়ই আশ্রয় নেবে, যেথায় জীবনের গতিশীলতা খুঁজে পাবে, জীবনের হিসাব মেলাতে পারবে, মানুষের মর্যাদা পাবে সেখানে কালে মানুষ ঠাঁই নেবেই।

গোটা বিশ্বকে মুসলিম বানানো আমার স্বপ্ন নয়। আমার এক স্যার বলতেন, "গরু খেয়ে মুসলমান।" আমি তেমন মুসলিম চাই যারা শৌর্যে, বীর্যে, আভিজাত্যে, কর্মে ও আদর্শে হবে মুসলিম। শুধু গো-মাংস ভক্ষণ করলেই তো আর মুসলমান হওয়া যায় না। তাই আমরা যারা মুসলিম নামধারী অনেকেই কিন্তু কার্যতঃ আমরা আচরনে মোটেই মুমিন নই। মুসলিম হতে হবে কুরআনের তেজে বলিয়ান যেখানে সত্য থাকলে মিথ্যার কোন প্রশ্রয় থাকবে না। যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো দালালী চলবে না।

যুগে যুগে মুক্তির অন্বেষায় দিশেহারা মানুষ যেখানে বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে সেখানেই ঠাঁই নিয়েছে। ভারতের সেই প্রখ্যাত ইসলাম উদ্দিনের মতই ডঃ যিয়াউর রহমান আজ থেকে ৩৪ বছর আগে ১৯৪৩সালে ভারতের আজমগড় জিলার এক মহকুমা শহরে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তারা অনেক ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। তার ভাষ্যে, "প্রকৃত ব্যাপার এই যে হিন্দু ধর্মের পৌরানিক বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে আত্মতুষ্টির কোন উপাদান নেই। এ কারনেই হিন্দু যুব শ্রেণীর মধ্যে ধর্মের পৌরানিক ধারণা ও অদ্ভুত আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে চরম অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়।"

এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেন, "বর্তমান দুনিয়ার একটা বিরাট অংশ নাস্তিক চিন্তাধারা ও মতবাদের পাদপীঠ হয়ে পড়েছে। এ মতবাদ মানবজাতিকে মানসিক, ইন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মানুষের সমস্যা ও দুঃখ দুর্দশা ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। বর্তমান জগত এ ইজমের প্রতি ত্যক্ত বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ও সংগঠিত পন্থায় ইসলামী বিশ্বে তার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বয়ং মুসলিমদের থেকে কিছু সংখ্যক দালাল পাওয়া গেছে। আমার মতে এ অবস্থায় পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। ইসলাম কোন মানুষের মনগড়া ধর্ম নয়, আল্লাহর অবতীর্ণ দ্বীন। মনগড়া চিন্তাধারা ও মতবাদ তার মোকাবেলায় বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। এখন প্রয়োজন এই যে, এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সাফল্য লাভের জন্য মুসলিম চিন্তাশীলগণকে ময়দানে নামতে হবে এবং ওসব পথভ্রষ্টকারী চিন্তা ও মতবাদের মোকাবেলায় ইসলামকে পেশ করতে হবে। এমন করা হলে আমার বিশ্বাস, এ নাস্তিক মতবাদ বালির বাঁধের ন্যায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চিন্তাশীলদের তৈরী সাহিত্যের বরাত দিয়ে বলতে চাই, এ সাহিত্য নিঃসন্দেহে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সাফল্য অর্জনের পূর্ণ যোগ্যতা রাখে।"

উল্লেখ্য, ভারতের ডঃ যিয়াউর রহমান আযমী নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। শেষ মূহূর্তে তার পরিবার তাকে মুসলিম হওয়ার পরিবর্তে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি মুসলিমদের দ্বারা নয়, বরঞ্চ ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মুসলমান হয়েছি।" উল্লেখ্য উপরে দেখা যায় তার পরিবার ধর্মান্তর মানছে তবে ইসলামের বদলে খৃষ্টান ধর্মটি পছন্দ করছে। এর কারণ আর কিছু নয় সংকীর্ণ মানসিকতা ও মুসলিম বিদ্বেষ যা বহু যুগ থেকে স্বযত্নে লালন করা হচ্ছে

ঐ জমিতে, যদিও প্রকৃত ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত বর্ণ হিন্দুরা নিচু সম্প্রদায়ের সব হিন্দুকে, বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলিমকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, পশুরও অধম মনে করে। তার চেয়ে গরু তাদের গুরুজন, পূজনীয়। তসলিমা ঐ খেলায় নিজেকে মাতিয়ে নিয়েছেন। তসলিমার সাথে তার ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথের সাথে মিল এক জায়গায়, উভয়েই মুসলিম বিদ্বেষী। এটি বলছি এ কারণেই যে এদের কারণেই ভারতে সাম্প্রদায়িক ক্ষতের উপর কোন মলম পড়েনি। তাই ঘাঁ শুকাচ্ছে না, তোষের আগুন আজ অবদি জ্বলছে অনির্বাণ। চাইলে তসলিমা ঐ সব ক্ষত নিরাময়ে দু চার কথা বলতে পারতেন, এতে উভয় দেশ উপকৃত হতো, পরস্পরের বোঝাপড়াতে অনেক জটিলতা কমতো। তবে এটি ঠিক তাহলে আনন্দ পুরষ্কার তার ভাগে জুটতো না।

# যুক্তির সন্ধানে মুক্তির অন্বেষায়

"নির্বাচিত কলাম" ইতিমধ্যেই একটা চরম বিতর্কিত বই, তাছাড়াও এই লেখিকার বেশ কয়টি বইএ অনেক আপত্তিজনক কথাবার্তা সমালোচনার ঝড় তুলেছে। সমাজের নানান অনাচারের প্রতিবাদ লেখিকা করেছেন যা সমর্থণযোগ্য ও ইতিবাচক। আবার অনেক বক্তব্য আছে আমি মনে করি এগুলির প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্তব্য। মোটামোটি আমি তার প্রশ্নের অনেক জবাব দেবার চেষ্টা করেছি। জগতের সমস্ত অনাচার, মিথ্যাচার, ভন্ডামী, কুসংস্কারের জঞ্জাল সরাতে একখানি যুগদর্শন হাতে এক মহামানব মুক্তির দিশারী হয়ে আশার আলো দেখিয়ে গেছেন। তিনি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন মানবতার কল্যানে। সুদীর্ঘ তেইশটি বছর বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে এই মহামানবের হাতেই সত্যের সেই অস্ত্রখানি নাজেল হয় থেমে থেমে, যাতে ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য থাকাতে মানুষ এটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এটা কোন কল্পকাহিনী নয়, বাস্তব জীবন চরিত এটাতে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

নির্বাচিত কলামের ৮৫পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত "ধর্ম বিজ্ঞান ও প্রগতির বিপক্ষে কথা বলে" কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা একারণে যে যুক্তি অন্য ধর্মে না টিকলেও কুরআনের সাথে যুক্তির বড় আত্মীয়তা। এ কারণেই এর সাথে বিজ্ঞানের কোন দ্বন্ধ নেই, ধর্মই একটা বিজ্ঞান। শান্তির ধর্ম ইসলাম কখানো প্রগতি বিরোধী নয়। আপনাদের না জানার কারণে প্রয়োগের অভাবে এটাকে অপবাদ দেয়া ঠিক হবে না। তিনি তার বইএর ৫৩ পৃষ্ঠাতে বলেন,

"মা একটি ভুল বিশ্বাস নিয়ে গভীর রাত্তিরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন।" তিনি আরো বলেন, "কারা যেন আমার মাকে বুঝিয়েছে ধর্ম কর্মে মন দিলে হবে অপার শান্তিলাভ।" তাহলে এখানেও আমি বলবো আপনার মা কি জানতেন না (আর আপনি নির্ঘাৎ জানেন-ই না) এটা কারো মনগড়া উক্তি নয়। এটা স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত তবে কোন ফরজ ইবাদত নয়। যারা তাঁর প্রাণের প্রিয়, যারা তাঁর নেক বান্দা, তাদের জন্য এটা একটা অতিরিক্ত ইবাদত। আর গভীর নিশীথে বান্দা তার স্রষ্টার কাছে হৃদয় মন খুলে প্রার্থনা করতে পারে। বাস্তব জীবনে নানান ঝুট ঝামেলা মুক্ত এ সময়খানি হৃদয়মন খুলে প্রাণের কথা জানানোর শ্রেষ্ঠ সময়। তাই কুরআনে বেশ কয়েকটি জায়গায়ই এর উল্লেখ আছে যেখানে আল্লাহ এই বাড়তি ব্যবস্থাটুকু রেখেছেন সাধারণের জন্য নয়, তার মুমিনদের জন্য, যারা চাইবে তার নৈকট্য-- শুধু তাদের জন্য।

জগতের সকল জ্ঞানই যে আপনার আওতায় এসে গেছে তা আপনি বলতে পারেন না। আপনার বোকা মাকে কারা যেন ভুল তথ্য দিল, এটি সন্দেহ ও বিশ্বাস আপনার! আপনার মতো এতো চৌকশ, বুদ্ধিমান মেয়ে ধরতে পারলেন না যে তারা কারা? পক্ষান্তরে আরেকটি কথা এসে যাচ্ছে আপনি যাকে বোকা ঠাওরাচ্ছেন বিচিত্র কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোকারা ঐ কচ্ছপের মতো বিজয়ের মালা ছিনিয়েই নেবে আর বুদ্ধিমতি চতুর খরগোসের মতো আপনি বুদ্ধির বহরা নিয়ে পিছনে পড়ে থাকার দলেই থাকবেন নির্ঘাৎ।

এব্যাপারে কুরআন কি বলে দেখুন, "সত্যই রাত্রে (উপাসনার জন্য) ওটা আত্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক, প্রার্থণার উপযোগী ভাষার ও খুব উপযুক্ত সময় রাত্রি" (সুরা মোজাম্মেলঃ আয়াত ৬)।

"ওরা জেরুজালেমে, হিমালয়ে, হেরা পর্বতে বসে ধর্ম রচনা করেছে। এই ধর্মকে ওরা পবিত্র ঘোষনা করেছে। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে ওরা তোমাকে পাঁকে ফেলছে। ওরা তোমাকে পায়ের নিচে স্থান দিচ্ছে, ওরা তোমাকে রন্ধন শালায় পাঠাচ্ছে, ওরা তোমাকে সাজসজ্জা করাচ্ছে, ওরা তোমাকে সজ্জায় ওঠাচ্ছে, শয্যা থেকে যখন ইচ্ছা নামাচ্ছে। ওরা তোমাকে আবৃত করছে, প্রয়োজনে অনাবৃত করছে। ওরা তোমাকে পদাঘাত করছে, পরিহার করছে। ওরা তো মানুষ নয় ওরা পুরুষ" (নির্বাচিত কলাম)।

১২৬পৃষ্ঠার নির্বাচিত কলামের পুরুষ বিদ্রোহ আমি মানলাম। পুরুষ শাসিত সমাজের কোনঠাসা নীতিতে লেখিকা আজ ক্ষ্যাপা। কিন্তু পুরুষকে লাঞ্ছিত করবেন বলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি করলে সাহিত্য হয়তো সৃষ্টি হবে, সুসাহিত্য তো গড়ে উঠবে না। অনেকেই সুকৌশলে সাহিত্যের নামে অনেক মিথ্যাচার জুড়ে দেন কিন্তু ঐতিহাসিক কোন তথ্যকে বিকৃত করে প্রয়োগ করাটা ঠিক নয়। যোগ্য বিচারককে যেমনটি নিরপেক্ষ হতে হয় তেমনি একজন কলমধারীরও ঐতিহাসিক তথ্যাবলির ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। সৃষ্টির নামে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যের টুটি চেপে ধরাটা অন্যায়।

ওরা পুরুষরা বুঝি জেরূজালেমে, হিমালয়ে এবং হেরাতে বসে ধর্ম রচনা করেছে। ইতিহাসের ছাত্রী আমিও। জেরুজালেম মূলতঃ মুসলমানদেরই পূণ্যভূমি। অতীতে জেরুজালেমের দিকেই কেবলা করে নামাজ পড়া হতো, ঠিক। ঐশী কিতাবও এসেছিল নবীদের মাধ্যমে তাও ঠিক। আর পরবর্তীতে ঐ নবীর পরবর্তী অনুসারীরা ঐশী কিতাবের সতীত্বহানী ঘটায় নিজের মনগড়া কথাবার্তা ঢুকিয়ে। হিমালয়ের পাদদেশে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়।

"হেরাতে বসে ধর্ম রচনা হয়" এমন কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই; তাহলে যে উম্মি অশিক্ষিত নবী এই মহাগ্রন্থ রচনা করতে পেরেছেন আপনারা নাস্তিকদের ওকালতিতে অন্ততঃ একটা নোবেল পুরষ্কারের ব্যবস্থা করুন সেই অশিক্ষিত নবীর মরণোত্তর পুরষ্কার হিসাবে। ইসলাম আজীবন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআন সম্বন্ধে বলেছে, এটা কোন মানুষের সৃষ্টি নয়, এটা এমনই একটা ঐশী গ্রন্থ যার একটা শব্দও পরিবর্তন করার শক্তি দুনিয়াতে কোন ইহ জাগতিক শক্তির কাজ নয়। কুর'আন সম্বন্ধে এমন চ্যালেঞ্জ বুঝি আপনার জানা ছিল না! আপনি মনে করেছেন অতীতের ঐশী কেতাবগুলোর মতোই এটারও বুঝি এমন তরো দিনহীন অবস্থা? একজন খ্রীষ্টান লেখক এর নিজেরই লেখা "Fifty thousands errors in Bible" অর্থাৎ বাইবেলে হাজার হাজার ভুল কথা আছে এই জন্য যে এটা তার অনুসারী কর্তৃক কর্তন বর্দ্ধন হয়েছে।

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ কি বলে দেখুন---"নিঃসন্দেহ আমরা নিজেই স্মরক গ্রন্থ (কু'রআন) অবতরণ করেছি, আর আমরাই তো এর সংরক্ষণকারী (কাজেই এই কু'রআন যুগ যুগান্ত পর্যন্ত যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক তেমনি অটুট থাকবে, এর একটি বাক্য বা শব্দও কখনো অদল বদল বা বিনষ্ট হবার নয়। (সুরা হাজর ৯আয়াত) (বি দ্রঃ---আল্লাহ 'আমি' না বলে 'আমরা' বলেন। আরবীতে এ স্টাইল চলে)।

তাই এই কু'রআন নামক মহাগ্রন্থের যে আদেশ, উপদেশ, দায়িত্ব, কর্তব্য যে জীবন বিধান দেয়া হয়েছে তা কোন পুরুষ কর্তৃক প্রণীত কোন নির্দেশনা নয়। এরাই পৃথিবীতে একটি মাত্র গোষ্ঠী যারা দাবী করে যে তাদের হাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কেতাব এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। সুতরাং আমরা বড়ই নিশ্চিন্ত এবং পরম নিরাপত্তার মধ্যে আছি যে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই তার বিকার ঘটাতে পারে।

আরো শুনতে চান। কম করে হলে ৩০/ ৩৫টা উদ্ধৃতি আমি দিতে পারতাম এই কু'রআন সম্বন্ধে কু'রআন থেকেই। নিচে আরো দুই একটি দেয়া হলো।

"এই সেই মহাগ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই সাবধানীদের জন্য এ গ্রন্থ পথনির্দেশক" (সুরা বাকারাহ এর ৩ আয়াত)।

এ গ্রন্থখানি আমরা তোমার কাছে অবতারণ করেছি, কল্যাণময় (গ্রন্থ), যেন তারা এর আয়াতগুলো সম্বন্ধে ভাবতে পারে (এবং তা থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করে, হৃদয়ের কপাট তালাবদ্ধ রেখে তোতাপাখির মতো শুধু তিলাওৎ করে গেলেই কু'রআন পাঠের উদ্দেশ্য সফল হবে না, ৪৭: ২৪) আর বুদ্ধি শুদ্ধি থাকা লোকেরা (এ থেকে মনিমুক্তো) আহরণ পূর্বক যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে (সুরা স্বাদ: ২৯আয়াত)।

"এটি (এই কু'রআন) জগদ্বাসীদের জন্য স্মরনীয় বার্তা বৈ তো নয়। আর তোমরা অবশ্যই এর বৃত্তান্ত (যে খাটি সত্য সে) সম্মন্ধে কিছুকাল পরেই জানতে পারবে কারণ তোমরা চোখের সামনেই দেখতে পাবে যে ইসলাম দিনে দিনে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে আর অসত্য পদে পদে মার খাচ্ছে ৮:৮; ৩৮:৬৭আয়াত) (সুরা স্বাদ: ৮৭,৮৮ আয়াত)।

এবার সুরা হাশরের কিছু অংশ কবিতার ভাষায় বলি---

"এই সে কুরআন যদি রাখিতাম পাহাড়ের পরে,
নিশ্চয় দেখিতে তুমি খোদারই যে ডরে
ধ্বসে যেত অধো গতি ঐ সে পাষাণ
টুটে যেত হয়ে খান খান।"

নাসরিন তার নির্বাচিত কলামে কুচক্রী মৌলবাদীদের সম্বন্ধে বলেন---"মানুষ শিক্ষিত না হলে সমাজও রাষ্ট্র নীতির সংস্কার না হলে কুচক্রী মৌলবাদীরা ধর্মের নামে মানুষকে কেবল পেছনে ঠেলবে, সামনে নয়।"

মানুষের মতো মানুষ হতে হলে শিক্ষিত হওয়া অবশ্যই একটি পূর্ব শর্ত। তবে সে শিক্ষা হতে হবে সুশিক্ষা। কুশিক্ষা যেমন মানুষকে অধঃপাতের চরমে পৌছায় কুচক্রী সব কাজই মানুষের মঙ্গলের বিরুদ্ধে চালিত হয় তা আমি অবশ্যই সমর্থন করছি। এব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে আসল মৌলবাদীদেরকে। মৌলবাদী কারা? যারাই মূলের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তারাই যদি মৌলবাদী হয় তবে এটা নিশ্চয়ই একটি ভাল গুণ। কারণ প্রতিটি শক্ত মূলের উপরই একমাত্র শক্তিশালী গাছ জন্মাতে পারে। আগাছা, পরগাছা এসব ঝড়ের আগেই বিপন্ন দশায় পৌছায়।

আমার মূল কোথায়? আমার সঠিক ঠিকানা কোথায়? কু'রআনই আমার আসল মৌলবাদী অস্ত্র। আমি কোন বাদের পূজা করি না। আমার স্রষ্টাই আমার ধ্যান ধারণা। তাই আমি বিশ্বাস করি আমার মূল বড় শক্ত খুঁটি। চুন থেকে পান খসলে আমার জাত যায় না, আমার ধর্ম নষ্ট হয় না এতো সহজে। তবে ধর্মের নামে মিথ্যা অপবাদ আমি সইবো কেন? তাইতো আমার এ প্রতিবাদনামা।

# তসলিমার তমসার তন্দ্রা কি কাটবে?

নির্বাচিত কলামের ১০৭ পৃষ্ঠায় এক উচ্চবিত্ত মহিলার কথা উল্লেখ করে নাসরিন বলেন, "আমি চলে আসতে বাধ্য হই কারণ এই মেয়েরা যারা নিজেদের খুব আধুনিক বলে দাবি করেন, স্বামীর ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কাগজপত্রে পরিচালক হিসাবে যারা বহাল আছেন, যারা অন্য পুরুষকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়াকেই নারী স্বাধীনতা বলেই ভাবেন হয়তো ওদের গা থেকে ভুর ভুর করে টাকার গন্ধ বেরিয়ে ঘরকে এত ঠেসে ধরেছিল যে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।"

আবার ক'টা পৃষ্ঠা ওল্টালেই তিনি বলেন, "একজন স্বাধীন মানুষের কখনো অন্যায় নয় বিলিয়নারদের ক্লাবে ভিনদেশী বান্ধবীর গালে চুমু খাওয়া, কখনো অন্যায় নয় পরকীয়া প্রেমে নিমজ্জিত হওয়া– কিন্তু সেই ব্যক্তির জন্য অবশ্যই এটি নিষিদ্ধ কাজ যে ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ ধর্ম নির্বাচন করে এবং সেই ধর্মের নাম হয় ইসলাম।"

হায় তসলিমা বড়ই উল্টাসিধা কথা আপনার! বুঝি না আসলেই কি মস্তিষ্কখানা বিকৃত? দু'টি প্যারাতে একটাতে বিলিওনারদের স্ত্রী চুমু খেলে আপনি ক্ষেপে যাচ্ছেন আবার অন্য প্যারাতে বিলিওনাররা বান্ধবীদের চুমু খেলে আপনি বাহবা দিচ্ছেন। বুঝতে পারছি না তার মানে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বোল বাজাতে গিয়ে আপনিই নারী নির্যাতন শুরু করে দিয়েছেন। আপনি কি যে বলতে চান আর আপনার সারিন্দা কি যে বাজাচ্ছে তা আল্লাহই মালুম। তবে এটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছি আপনার আসল চিহ্নিত শত্রু কে? সে পুরুষ নয়, সে ইসলাম। কারণ যতই পুরুষকে আপনি ধিক্কার দিন, আপনি বারে বারেই তাদের গলায় মালা দিচ্ছেন। আপনি ঘৃনায় পুরুষ স্পর্শহীন থাকতে পারলেন না।

আজ হঠাৎ শেরে বাংলা ফজলুল হকের একটা কথা মনে পড়লো। "আম গাছে আম ধরে বলেই লোকে ঢিল মারে, ফজলি আম গাছে আরো বেশী মারে, শ্যাওরা গাছে কেউ ঢিল মারে না।" তাই নাসরিনের ফজলি আম হচ্ছে "ইসলাম" নামক মন্ত্রখানি তাই তার টার্গেট আর কেউ নয়, সেই ফজলি আম। সম্ভবতঃ একারণেই বোলতার চাকেই ঢিল পড়েছে তাইতো আজ ভীনদেশে পরবাসী নারী।

পুরুষ যে আপনার নকল শত্রু তার আরো প্রমাণ আছে। আপনি স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিদ্যা সাগরের জন্য ঋণী হয়ে আছেন। একথা নির্ঘাৎ সত্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার করেছিলেন, হিন্দু সমাজকে সতিদাহের কালো থাবা থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু আপনি এত উৎফুল্লচিত্ত হচ্ছেন কেন, বুঝলাম না। উনি তো মহিলা নন, ইনিও তো পুরুষ। তার বদলে আপনি বেগম রোকেয়ার কথা, সামছুন্নাহার মাহমুদের কথা পাড়তে পারতেন। ওরা তো নারী, আর নারী জাগরনের জন্য ওরা কম করেন নি। এদেশের নারীদের শিক্ষার ভিত ওরাই গড়ে দিয়েছেন।

পুরুষের উদ্দেশ্যে ছন্দবদ্ধ ক'টি লাইন আপনার নির্বাচিত কলাম থেকে আমি উদ্ধৃত করছি। "ওদের কথা ভেবো না। ওরা তো মানুষ নয়, ওরা পুরুষ। ওরা তোমার বিকেলের চায়ে গোপনে বিষ মিশিয়ে দেবে। ওরা কৃষ্ণপক্ষ রাতে তোমার গলায় দড়ি বেধে ঝুলিয়ে দেবে আম গাছের ডালে, ঘরের সিলিং ফ্যানে, কড়ি বর্গাকাঠে: ওরা কাঁচপুর ব্রিজের কাছে তোমার বুকে ছুরি বসাবে , ওরা ধাবমান ট্রেনের নীচে তোমাকে ধাক্কা দেবে, ওরা তোমার কণ্ঠদেশ চিরে দেবে ধারালো ব্লেডে, ওরা তোমার সারা গায়ে কেরোসিন

ঢেলে আগুন জ্বেলে দেবে, ওরা তো মানুষ নয়, ওরা পুরুষ।" আপনার এ ক'টি লাইন আমাকে মুগ্ধ করেছে, আহত করেছে, কষ্টও দিয়েছে।

সমাজে ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক সময় অধর্মকর্ম হিসাবেও অনেক বেদনাঘন ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটে যায়। যা সম্মন্ধে আমাদের সবার সচেতন হওয়া উচিত। অজ্ঞানতার দোহাই দিয়ে সর্বযুগে দুর্বলের উপর করেছে সবল অত্যাচার। তাইতো নারীকে অবশ্যই সবল হতে হবে। নয়তো যুগ যুগ ধরে মার খাবে নারী এবং আমার বিশ্বাস ইসলামই একমাত্র মাধ্যম যার হালকে শক্ত করে ধরলে পুরুষের বাবারও কাম নাই নারীকে লাঞ্ছিত করে। আজকের সুশিক্ষিত নারী আর অসহায় দুর্বল নয়। তাকে জানতে হবে তার পরিচয়, তার গন্তব্য তাকে ঠিক করতে হবে। সে কোথা হতে এসেছে, আর কোথায় তার প্রত্যাবর্তন। নিজের দিশা ঠিক করে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে।

সারা জগৎ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সেদিন ইসলামের প্রথম সদস্যা হয়েছিলেন বিবি খাদিজা(রাঃ), কোন পুরুষ নয়, একজন নারী। বিবি সুমাইয়া বিশ্বে প্রথম মুসলিম শহীদ নারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। বিবি ফাতেমা এই মহিয়সী নারী আল্লাহর রাস্তায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর নিন্দা জানিয়েছেন এবং তাদের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ উপস্থাপন করেছিলেন। ইতিহাস পড়ে দেখুন বিবি আয়েশা(রাঃ) সিফফিনের যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ইতিহাস তথ্যে প্রাপ্ত, যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহিলারা আহতদের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নারী জনম নিষ্ক্রিয় ছিল না। যার যার ক্ষেত্রে থেকে এসব মহিয়সীরা কাজ করে গেছেন পুরুষের সাথে সমান তালে। আপনাদের অজ্ঞতাই আপনাদের পিছনে পড়ে থাকার কারণ। তার জন্য আপনার সমাজ ব্যবস্থা, আপনিই দায়ী–ইসলাম দায়ী নয়।

হযরতের এবং তার মহিমান্বিত খলিফা চতুষ্টয়ের সময় মুসলিম মহিলারা সমর ক্ষেত্রে আহতের সেবাশুশ্রুষা করতেন। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে তাদের ক্ষতস্থানগুলিতে ঔষধ লাগিয়ে ও পট্টি বেঁধে তাদের সেবা শুশ্রুষা করতেন। তাঁরা মহিলারা রণক্ষেত্রে প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতেন এবং আবশ্যক হলে এই মুসলিম বীরাঙ্গনারা স্বামী ও ভ্রাতার, পিতা ও পুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ তরবারী হাতে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। ইসলামে প্রাথমিক যুগের ইতিহাস পৃষ্ঠাগুলি এই ধরণের মহিলাদের অক্ষয় কীর্তি কল্যাণে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। একদল মহিলা এসব বীরত্বপূর্ণ কাজের মাধ্যমে খায়বার যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। জনৈক কিশোরী নিজের কণ্ঠমালা প্রদর্শন করে আনন্দে গদ গদ স্বরে বলতেন, 'আমার কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে হজরত নিজে আমাকে এই পুরষ্কার প্রদান করেছেন (আবু দাউদ, কানজুল ওম্মাল ও সাধারণ পুস্তিকায় এসব তথ্য পাওয়া যায়)।

সারাটা নির্বাচিত কলাম জুড়ে নারীদের করুণ ব্যর্থতা, হাহাকার আর আর্তনাদ দিয়ে লেখিকা নারীদের একরাশ বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কিন্তু একি! অবশেষে আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম, এ কিসের আলামত! নাসরিন তো তার নৈবেদ্যের ডালা সাজিয়ে তুলেছেন এক পুরুষের জন্য। চমকে উঠারই কথা! পুরুষের আচরণে রুষ্ট এ নারীর হঠাৎ কি ভীমরতি ধরলো নাকি? কে সেই পুরুষ? নিশ্চয়ই আপনাদের জানতে ইচ্ছে করছে? আর সেই সব পাঠকরা ইতিমধ্যে নিশ্চয় জেনেছেন আপনারা যারা নির্বাচিত কলাম পড়েছেন। সে হলো ভলাদিমির ইলিচ লেলিন। উনিই নাকি পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি নারীর বড় লাভ করে দিয়েছেন। তাই তার পতনে নারীর বড় ক্ষতি হলো বলে নাসরিনের আক্ষেপের শেষ নেই। তারই স্বজাতি তার মূর্তি চূড়া থেকে নামিয়ে ফেলেছে। শুনেছি এই মহাত্মনের মূর্তি নাকি এক কানাকড়িতে নিলামে উঠে নি সে এমনি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। এই তার আদর্শের অবস্থা, পরিণতি। পতিত লেনিনের জন্য সবচেয়ে নাকি ক্ষতিগ্রস্থ হলো নারী।

নাসরিনের ভাষায় "আমরা নারীরা আজ পতিত লেনিনের জন্য, পতিত আদর্শের জন্য, পতিত সাম্যের জন্য শোকস্তব্ধ মাথা নত করছি।"

তার এই 'আমরা নারীরা' কয়জন জানি না, তবে এদেশের কয়জন নারী তার নাম জানে যে শোকগাঁথা করবে আর পতিত নেতার মিছিলে যোগ দেবে? পুরুষ বিদ্রোহী নারীর লেলিন গাথা হজম করার পর সবচেয়ে বড় বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বইটির শেষের পৃষ্ঠায়। যতটুকুও বা শ্রদ্ধাবোধ আমার অবশিষ্ট ছিল একজন সাহিত্যিকার প্রতি, মুহূর্তে যেন তা কোথায় উবে গেল।

ভিতে ফাটল রেখে সাততালা দালান হয়তো উঠানো যায়, কিন্তু টেকে না, একথাটা এক'শ ভাগ সত্য কিন্তু আপনার আদর্শটা কি? আর আপনার ভিতটা কতটুকু শক্ত? যে আদর্শের বড়াই আপনি করছেন তাতো আজ ধূলায় ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। আপনি নারীর নারীত্বকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। আপনি অজস্র জারজ সন্তানের মা হতে চান।

এই মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব হতে পারে তার সমুন্নত কার্যধারা পালনের মাধ্যমে। নয়তো এই মানুষ নরকের কীট রূপে পরিগণিত হবে নিজেরই কর্মধারার বিনিময়ে। আমি নারী হয়েছি বলে ব্যর্থ জীবনের দুন্দুভি বাজাতে তো আসি নি এই পৃথিবীতে? শ্রেষ্ঠ নারীদের জলসায় নাম লেখাতে আমার সড় সাধ! শ্রেষ্ঠ সন্তানের মা হতে আমার বড় আহ্লাদ। শ্রেষ্ঠ মায়ের মেয়ে আমি হতে চাই। শ্রেষ্ঠ বাবার কন্যা আমি হতে চাই, শ্রেষ্ঠ ভাই এর বোন আমি হতে চাই। শ্রেষ্ঠ স্বামীর স্ত্রী আমি হতে চাই। আপনি চান নারী তার জরায়ু নিয়ে ব্যবসা করুক। বংশ রক্ষার নামে কুক্কুরীর মতো স্বাধীনতা ভোগ করুক। মাতৃত্বের নামে নরহত্যা বা পুত্রহত্যা করতে চান, সম্ভবতঃ?

ধিক্ আপনার নারী জনম! এতক্ষণ মনে হয়েছিল কিছুটা হলেও আপনি নারী দরদী। এবার আপনাকে আমার মনে হচ্ছে আপনি রাক্ষুসী, আপনি ডাইনী, আপনি অন্ধকারে পড়ে থাকা দলের লোক, যাদের হিসাব বাম হাতে ধরা থাকবে। আপনি সেই 'মোহর মারা' দলের লোক --।

"

(১) বিবাহ (স্বামী) সঙ্গ ছাড়া নারী সন্তানবতী হতে পারে না।

(২) বংশ (বংশ রক্ষার কাজ কন্যা দিয়ে চলে না, তাই পুত্রের প্রয়োজন।)

(৩) মাতৃত্ব (যেহেতু মাতৃত্ব নারী জন্মের সার্থকতা, তাই নারী জন্মকে সার্থক করতে হবে)।"

উপরোক্ত তিনটি শর্ত পুরুষ কর্তৃক আরোপিত হওয়ায় লেখিকা এগুলোর স্বাধীনতা চান। বৈবাহিক ব্যবস্থা ছাড়া জীবন যদি আপনার লেলিনবাদের আদর্শ হয়, শিয়াল কুক্কুরীর জীবনই যদি নারীর জন্য কাম্য তবে বৈদিক যুগের নারীদের শকুনী, নেউল, ছুঁচো, কুকুর বলে শাস্ত্রের গালিতে চটলেন কেন রে ভাই? নারীর সর্বনাশ শুধু পুরুষ করে না, নারীও নারীর সর্বনাশ করে। আর আপনিই তার কম কি?

বংশ রক্ষা কন্যা দিয়ে চলে না কিন্তু আমি যে মহাপুরুষের অনুসারী তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কন্যা ছাড়া বংশ রক্ষা হয় না। এমন কথা কোন সুশাস্ত্রে লেখা নেই। যদি থাকে আমি বলবো তা কুশাস্ত্র। আর মাতৃত্ব যে কি জিনিস তা মায়েরাই ভাল জানেন। তাই শিক্ষা দিয়ে নারী পুরুষের বিভেদ কাটাতে পারলে এসবের সহজ সমাধান হয়। আপনি সহজ রাস্তায় না গিয়ে বাইবেলে বর্ণিত শয়তান যেমন নারীদের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষন করার পায়তারা করেছিল আপনিও ঠিক একই রূপে নারী অসহায়ত্বের সুযোগ দেখিয়ে তাদের হাইকোর্ট দেখাতে চান।

ধিক! আপনার নারী জনম! সমস্ত নারীদের মুক্তির জন্য আমি স্রষ্টার সাহায্য চাই। আল্লাহ নারীদের সত্য ও সুন্দরের রাস্তায় চলার তওফিক দান করুন।

অনেক সময় আপনি অবান্তর প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন, যেমন – আপনি ছিমছাম মানুষ, কোন ঝুট ঝামেলা নেই, বাড়ীওয়ালাদের খুশী হওয়ার কথা, অথচ তারা খুশী হয় না। তারা আপনার সাথের পুরুষটাকে খোঁজে। এটি আপনি ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন একজন অবিবাহিত ছেলেরও বাসা পেতে কষ্ট হয়, এমন কি পায়ই না। কারণ বাড়ীওয়ালারা ভুক্তভোগী, এ ধরণের পরিবেশে সমাজের অনেক অনাচার হয়। অবিবাহিত পুরুষ, নারী কাউকেই আমাদের দেশের বাড়ীওয়ালারা ভাড়া দিতে উৎসাহী হন না।

শখ করে কেউ জঞ্জাল বাধাতে চায় না বলেই এমনটি ঘটে। আমারই পরিচিত এক ভাই প্রথম চাকুরী পেয়ে বাসা ভাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তার এক খালাতো বোনের সাথে থাকতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু একাকী বাসা সে জোগাড় করতে পারে নি। তবে বিবাহিত হলে আর সমস্যা হয় না। বাড়ীওয়ালারা মনে করে এতে ঝামেলা হয় না অন্ততঃ সমাজের অপকর্ম হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়। কেউ যেচে ফেউ ডেকে আনতে চায় না। সাধারণ মানুষ স্বভাবতঃই শান্তিপূর্ণ অবস্থানে বিশ্বাসী, অযাচিত উপদ্রব রোধ করতেই বাড়ীওয়ালাদের এই ব্যবস্থা। মেস হলে অনেক সময় তাও তারা উৎসাহের সাথে ভাড়া দেয় কিন্তু একাকী একটা ছেলে বা মেয়েকে বাড়ীওয়ালারা গ্যাঞ্জামই ভাবে।

আপনি এক উঠোন মানুষের সামনে গায়ের জামাটা খুলতে পারেন নি বলে আপনার আক্ষেপ, পুরুষের মতো জলবিয়োগ করতে পারছেন না বলে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন, সমাজকে চিহ্নিত করছেন। আপনার আমার পূর্ব পুরুষরা জঙ্গলে জঙ্গলে একদিন ঘুরে বেড়িয়েছিল আমার মনে হয় আজকের আধুনিকতার এ বিস্ময়কর যুগে এসেও আপনার অন্তরে সেই বনের আদীমতাই প্রভাব ফেলছে। ওখানে ছেলে মেয়ে দুজনেই ছিল গরু-ছাগল-বাঘ ভালুকের মতই। সেই বন্য জীবনই আপনাদের মতো চিন্তাশীলদের শান্তি নিকেতন হওয়া উচিত।

# ভিন সম্প্রদায়ের মনিষীদের দৃষ্ঠিতে

নাসরিন আপনি আপনার নিজের সম্প্রদায় চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন যদিও কিন্তু ভিন সম্প্রদায়ের এরকম অনেকেই আছেন যারা যুগে যুগে আপনার সম্প্রদায়ের সত্যিকারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন শুধু মুখে নয় কথায়, ভাষায়, লেখনীতে তার তথ্য প্রমাণ রেখে গেছেন অজস্র ধারায়, আজ আমি তার মাত্র কয়টি উদাহরণ তুলে ধরছি।

নাসরিন আপনি যার বিরুদ্ধে সত্যের অপলাপ করে বলছেন যে তিনি হেরায় বসে নারী নিপীড়নের জন্য ধর্ম রচনা করেছেন, হায়রে আফসোস! সারা দুনিয়ার বঞ্চিত নিপীড়িতের জন্য যার সারা জীবনের সাধনা তাকেই আপনি প্রতারক চিহ্নিত করলেন! আপনি তো আজ ইসলামের পরিচয় নিয়ে জগতময় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অন্ততঃ আপনার নাম তো তাই বলে এবার দেখুন একজন বিধর্মী গবেষক যিনি সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি যত জ্ঞানী, গুনী, তাপস, মানবতাবাদী, সমাজসেবী, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক সব গুণান্বিত মহাপুরুষদের এক তালিকা প্রস্তুত করেছেন এতে একশত মানুষের ঠাঁই পেয়েছে এবং তাদের কার্যধারার ফিরিস্তিও বইটাতে গাওয়া হয়েছে। বইখানির নাম হয়তো আপনার জানা নেই কারণ জানলে বা পড়লে আপনার বিকার কিছুটা হলেও কাটতো, আমি তারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

বইটি মিকাইল হার্টের লেখা "দি হান্ডড্রেড" সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই গবেষকের দৃষ্টিতে আপনার টার্গেট এই ধর্ম রচয়িতাই প্রথম নির্বাচিত পুরুষ। একশত জন নির্বাচিত মহাপুরুষের প্রথমে যার অবস্থান তাঁর বিরুদ্ধে একরাশ মিথ্যার অপবাদ দিয়ে আপনি টিকে থাকবেন কতক্ষণ?

"My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

Nevertheless, in a scant century of fighting, these Bedouin tribesman, inspired by the word of the prophet, had carved out an empire stretching from the borders of India to the Atlantic Ocean, the largest empire that the world had yet seen.

We see, then, that Arab conquests of the seventh century have continued to play an important role in human history, down to the present day. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history.

অর্থাৎ "মোহাম্মদকে আমার শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে নির্ধারণ করার ব্যাপারটি অনেক পাঠকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার হিসাবে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি একই সাথে ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার মানদন্ডে সাফল্যজনকভাবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ রকম একটি যুদ্ধবাজ বেদুইন জাতি শুধু মাত্র একজন নবীর নির্দেশে তাদের বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেন সীমানা হিসাবে একদিকে ভারত এবং আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত। এত বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য পৃথিবীতে এর আগে কেউ দেখে নি।

বাস্তবে আমরা দেখি যে এই আরব বিজেতারা সপ্তম শতাব্দী থেকে আজ অবদি মানব জাতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচনা করেন। এটা এমন একটা অসম সমন্বয় যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং ধর্ম একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে এবং মানব জাতির ইতিহাসে এটিই একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে আমার চোখে ধরা পড়েছে।" উপরে লেখক এভাবেই বিবৃত করেন তার নিজের ভাষায় এবং বিধর্মী একজন সত্য সাধককে তিনি সত্যের মানদন্ডে এভাবেই সম্মানিত করেন।

এই খৃষ্টান গবেষক দ্বিতীয় চিহ্নিত মহামানবরূপে আইজ্যাক নিউটন ও তৃতীয়রূপে তার নিজের ধর্মনেতা জেসাস ক্রাইস্টকে আখ্যায়িত করেন। সংকীর্ণতা দিয়ে তিনি এই উপাখ্যান রচনা করেন নি, যোগ্যতা দিয়েই করেছিলেন। নয়তো তার নিজের নেতাকে তৃতীয় বানাতেন না, এক্ষেত্রে লেখক নিরপেক্ষ থেকে সত্যনিষ্ট বিচারকের রায় দিয়েছিলেন।

ইসলামের আবেদন চিরন্তন, শ্বাশত ও চিরঞ্জীব। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আরব ভূমিতে সমাগত বিধর্মী সেনাদের কথাই ধরা যাক। যুদ্ধ যখন শেষ হলো, তখন সউদী আরবে আমেরিকান সৈন্যদের আগমনের ফলে সেখানে জীবনযাত্রায় যে প্রভাব এসেছে তা সামলাতে যেমন ব্যস্ত, তেমনি আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে ইসলামী জীবনবোধের রস সিঞ্চিত হওয়ায় সে দেশের কতৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। এই উদ্বিগ্নতা চরমে উঠেছে যখন আমেরিকান সৈন্যরা শয়ে শয়ে ইসলাম গ্রহণ করে দেশে ফিরে গেছে এবং সেখানে গিয়েও অন্যদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করছে। এর সুদূর প্রসারী ফল কি হতে পারে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই পশ্চিমা পত্রিকাগুলোতে বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছে। ফ্রান্সের একটি পত্রিকা সম্প্রতি টেক্সাসে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সেনাঘাটিতে সৈন্যদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, "সউদী আরবে অবস্থানরত সৈন্যরাই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। দেশে ফিরে গিয়ে তারা আরো অনেক সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে ইসলামে দিক্ষীত করেছে এবং সকলে মিলে আমেরিকায় মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করে সেসব স্থানে এখন নিয়মিত যাতায়াত করছে।"

ইসলাম গ্রহণকারী সৈন্যদের সঠিক সংখ্যা যদিও পাওয়া যায়নি, তবে আরব মিশনারীরা বলছে, সেদেশে সুষ্ঠভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য তা সন্তোষজনক। ফ্রান্সের পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে, "অন্যান্য ধর্মের তুলনায় আমেরিকায় ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটছে। নিকট ভবিষ্যতে ইসলাম আমেরিকার একটি সর্বজনীন পছন্দের ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হবে।" টেক্সাসে ইসলাম গ্রহণকারী সৈন্যদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

এভাবেই ইসলামের গণজোয়ার শুরু হয়েছে। আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে এই গণজোয়ার হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" (তথ্য সংগ্রহ: ইকো অব ইসলাম পত্রিকা অবলম্বনে মুসলিম জাহান পত্রিকায় মুদ্রিত (ঢাকা–১৬ই চৈত্র ১৩৯৯ বাংলা)।

নাসরিন কর্তৃক উত্থাপিত এই "ধর্ম রচয়িতার" অপবাদ ঘোচাতে আরো কিছু বিধর্মী সুধীজনের উদ্ধৃতি হিসাবে দু'চারটা নমুনা।

অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (পি এইচ ডি) বলেছেন যে, "এই পবিত্র নবী বলেছেন জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন পর্যন্ত গমন করো।" যখন ইউরাপ কুরুচি ও মূর্খতার গভীর গহ্বরে নিমগ্ন ছিল, যখন ইউরোপীয় রাজধানীতে ডাকিনীগন জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছিল ও জ্ঞানার্জন হলাহল সদৃশ ঘৃণিত হত, তখন মুসলিমগণ স্পেনের প্রত্যেক গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করছিলেন এবং শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা দিচ্ছিলেন।"

লাহোরের স্বনামখ্যাত বাবু প্রকাশ দেও বলেছেন, "হযরত মুহাম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। সঙ্কীর্ণমনা ও হিংসাবিদ্বেষপূর্ণ লোকেরা এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন, যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ও উদারচেতা তাহারা কখনো মানবের হিত ও উন্নতি সাধন প্রয়াসী হযরত মুহাম্মদের বহুল উপকার বিস্মৃত হয়ে অকৃতজ্ঞ হতে পারেন না। যারা এই কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করতে কুণ্ঠিত, তারা সম্পূর্ণ সংকীর্ণমনা ও সত্যাদ্রোহী।"

স্যার উইলিয়াম মূর বলেছেন, "সর্বশ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে হযরত মোহাম্মদের যৌবনকালীন শিষ্টতা ও আচার ব্যবহারের পবিত্রতা স্বীকার করেছেন। এরকম গুণাবলী সেকালে মক্কাবাসীদের মধ্যে অতি বিরল ছিল। এই সরল প্রকৃতি যুবকের সুন্দর চরিত্র ও সম্মানাস্পদ আচরণ তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে "আল-আমীন" আখ্যা লাভ করেছিলেন।"

বসওয়ার্থ স্মিথ বলেছেন, "হযরত মুহাম্মদ একাধারে সিজারের ন্যায় শাসনতন্ত্রের শীর্ষভাগে এবং পোপের ন্যায় ধর্ম মন্দিরের উচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন, কিন্তু তাহার পোপের ন্যায় জাকজমক ও সিজারের ন্যায় সেনাবল ছিল না। 'বেতনভোগী সেনা, অঙ্গরক্ষী সৈনিক, রাজকীয় প্রাসাদ ও নির্ধারিত রাজস্ব ব্যতীত স্বর্গীয় অধিকার বলে রাজত্ব করেছি' এ কথা বলবার অধিকার কেবল হযরত মুহাম্মদেরই ছিল; কারণ ক্ষমতার উপকরণ ও আশ্রয় ব্যতীত তিনি সর্ববিধ ক্ষমতায় ক্ষমতাশীল ছিলেন।"

স্যার টমাস কারলাইল বলেছেন, "ইসলামের সরল অর্থ আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ। স্বর্গ হতে ধরাতলে এ পর্যন্ত যে জ্ঞান প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তন্মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আরবজাতির পক্ষে ইহা অন্ধকার হতে জ্যোতি লাভ। আরব এ দ্বারাই প্রথমে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে।" জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন, "হযরত মুহাম্মদ স্বীয় গৃহে তাহার পরিজন কর্তৃক নবী বলে গৃহীত হয়েছিলেন।"

ডঃ আসওয়েল জনসন বলেন, "কু'রআনের বিধানাবলী এতই কার্যকর এবং সর্বকালের উপযোগী যে, সর্বযুগের দাবীই পূরণ করতে সক্ষম।"

আর্নল্ড টয়েনবি বলেন, "কু'রআনের বিধানাবলী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ" (সূত্র: প্রিচিং অব ইসলাম)।

সি এডি মারিল বলেন, "কু'রআনে মানব জাতির জন্য যেমন বুনিয়াদী আইন কানুন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি।"

পন্ডিত স্যার ডায়ান্দ্রবাস বলেন, "কু'রআনের বিধানাবলী শাহিনশাহ থেকে আরম্ভ করে মজুর পর্যন্ত সকলের জন্যই সমান উপযোগী ও কল্যানকর। দুনিয়ার অন্য কোন ব্যবস্থায় এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।"

জন ফাস বলেন, "কু'রআনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলোতে যে বলিষ্ট ও শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে না"। (সূত্র: দি উইসডম অব দ্য কু'রআন)

গীবন বলেন, "জীবনের প্রতিটি শাখার বাস্তব কার্যকরী বিধান কু'রআনে মওজুদ আছে।"

"ইসলাম কখনো অন্য কোন ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করে নাই। কখনো ধর্মের জন্য নির্যাতন, ধর্মমত বিরোধীদের দন্ডের ব্যবস্থা কিংবা দীক্ষা ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করে নাই। ইসলাম তার ধর্মমত জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেছে; কিন্তু তা গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করে নাই। ইসলাম পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের তৎকাল প্রচলিত শিশুহত্যা ও আরবের দাসত্ব প্রথা তিরোহীত করেছে। ইসলাম কেবল তার ধর্মানুবর্তী লোকদিগের উপর নয়, বরং বাহুবলে বিজিত সকলের উপর সমানভাবে নিরপেক্ষ বিচার সংস্থাপন করেছে"। জন ডেভেন পোর্ট (মুহাম্মদ এবং কুরআন গ্রন্থ থেকে, পৃষ্ঠা ৫৪, ১৩৩)।

মনীষী জন ডেভেন পোর্ট সত্য সত্যই বলেছেন. "মুসা ও ঈসার ধর্মপরায়নতা তাঁহাদের অপেক্ষা অন্য একজন মহান নবীর আগমন বার্তার আশ্বাস বানীতে উৎফুল্ল হয়েছিল। বাইবেলে অঙ্গীকৃত শান্তিদাতা অথবা শান্তিদাতাস্বরূপ পবিত্রাত্মা পরমেশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীর নামে ও তাহারই ব্যক্তিত্বে সম্পাদিত হয়েছে।" এই মনীষী "The greatest and the last of God's prophets" অর্থাৎ এই নবী, নবীদের মাঝে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষনবীর মহাগৌরবান্বিত আসন বহাল রেখে সত্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন। হযরত ঈসা স্বয়ং বলেছেন, "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel" অর্থাৎ "আমি কেবল মাত্র পথভ্রান্ত ইসরাইল বংশের জন্যই প্রেরিত হয়েছি" ( মেথ্যু ১৫:২৪)।

পূর্ববর্তী কোন ধর্মগ্রন্থে কোন নবী বিশ্বজগতের নবী বলে প্রচারিত হন নাই; কেবল শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা "সমগ্র মানব জাতীর নবী" "সকলের রসুল" বিশ্ব কল্যাণ আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন। এই কু'রআন গ্রন্থখানির সর্বত্রই এই সত্য সম্প্রচারিত হয়েছে সুনির্দিষ্ট সত্য তথ্যসহ। ঐতিহাসিক, প্রাকঐতিহাসিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন প্রমাণ পঞ্জিসহ উদাহরণ হয়ে এক জীবন্ত বাস্তব এই গ্রন্থটি আজ নানা তথ্যে ধন্য হচ্ছে, এর মাঝে লুকিয়ে আছে মানব জাতির অপরিসীম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম এক অবিশ্বাস্য সত্যের দলিল।

তাঁর প্রচারিত ধর্মোপদেশ ও ধর্মনীতি সুক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর প্রচারিত ধর্ম বিশ্বজনীন, তাঁর জ্ঞান জ্যোতি বিশ্বব্যাপী এবং তার মহানুভবতা সমগ্র মানবমন্ডলী পরিব্যাপ্ত। তিনিই দেশগত, জাতিগত সম্প্রদায়গত যাবতীয় কুসংস্কার তিরোহিত করে এক সার্বজনীন, সার্বভৌমিক ধর্মের ভিত্তিস্থাপন ও উহার উৎকর্ষ সাধনের বিহিত উপায় উদ্ভাবন করে গিয়েছেন।

তার কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে সুবিজ্ঞ জে আর মটের (J. R. Mott) ভাষায় বলবো, "The most perfect form of democracy has only been approached by Islam" ইসলামই গণতন্ত্রের পথিকৃত।

উপরে ডজনেরও বেশী উদ্ধৃতি দেয়া গেল শুধু বিধর্মী বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এরা কারো কেনা গোলাম ছিলেন না। এরা সত্যের সমঝদার ছিলেন তাই সত্যকে অকপটে স্বীকার করে গেছেন। আফসোস তসলিমা পরের দালালী করতে গিয়ে নিজের সমৃদ্ধ অতীত, বর্তমানকে অবলীলায় অস্বীকার করে অন্ধকার হাতড়ে বেড়িয়েছেন। শুধু মাত্র এখানের এই ডজন বিশেষজ্ঞদের মজলিসে তার নিজের অবস্থান কোথায় তা চিহ্নিত

করতে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করলেই উত্তর তার পাবার কথা। বিবেকবান শিক্ষিত মেয়ে তসলিমা অন্ধকারে থাকবেন, ভাবতেও কষ্ট লাগে।

# সংকীর্ণতার গন্ডিতে বাধা ধর্মের মহানুভবতা:

ইসলাম একটি বিশ্বধর্ম, এ ধর্ম তাই দাবী করে। এর উদারতা, মহানুভবতা যে কতো ব্যাপক তা অনেকেই আঁচ করতে পারেন না আর পারেন না বলেই অনেকে ধর্মটিকে সংকীর্ণ গন্ডির মাঝে বেধেই আত্ম তৃপ্তি খোঁজেন। অশিক্ষিত জনতার গবেষনাহীন কর্মকান্ডে অনেক সময় ধর্মের অনেক সৌন্দর্যহানী ঘটে থাকে কারণ এ ধর্মের মহানুভবতা, সত্যতা, সুন্দরতা, ব্যাপকতা, যথার্থতা আঁচ করবার মত ধারণ ক্ষমতাও মানুষের থাকা দরকার। সল্প শিক্ষিতের হাতে পড়ে অনেক সময় দেখা যায় ফতোয়ার নামে সমাজে যা তা বিলি করা হয় ধর্মের নামে। ধর্মচর্চার নামে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী শ্রেণীর লোক নাম মাত্র জ্ঞানধারী ধর্মধারী গোষ্ঠী নানান অপকর্ম করে বেড়ায় যদিও বাস্তবে সামান্য কিছু মুখস্ত বিদ্যে দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে পথহারা করে রাখে। এদের এক শ্রেণীর ধর্মটির উপর কোন গবেষণা, ধ্যান ধারণা নেই। এই অজ্ঞানতার মানদন্ডে তারা সমাজে ফতোয়া ও মাতব্বরির নামে অনেক অসত্য, অনাচার, পাপ কাজ করে। সাধারণ বোকা মানুষকে ধর্মের নামে এরা মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ব্যবসা চালায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় "হিল্লাহ বিয়ে" নামে এক অনাচারের এরাই সৃষ্টিকর্তা।

এদেরেই অনেক সময় তসলিমার মত অনেকে ধরে নেন এরাই ধর্মের মালিক মোক্তার। এদের বিরুদ্ধে না গিয়ে তারা সত্য তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্বধর্মের দাবীদার ধর্মকেই শত্রু জ্ঞান করছেন। বস্তুত এখানে যারা ধর্মটিকে তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, এরা প্রতারক ধার্মিক নয়। যাক তসলিমা নাসরিনের ধর্ম সম্বন্ধে এসব ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিতে আমি এখানে কিছু তথ্যের আলোকপাত করছি। নাসরিন কিছু সংখ্যক কু'রআনের আয়াতকে নিয়ে ইসলামকে এবং কু'রআনকে খেলো কথা বলায় তার কিছুটা ভুল বুঝার কারণে আমি তারই উল্লেখ্য আয়াতগুলি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

"ধর্ম তাদের যথেচ্ছাচারী করেছে। শুধু ইহকালেই নয়, পরকালেও নিজেদের ব্যবস্থা আরামপ্রদ করে রেখেছে তারা। সত্তর জন হুরী বেষ্টিত জীবন শুধু তারাই ভোগ করবে, আর মেয়েদের কপালে ইহকালের স্বামীটিই জুটবে।" তাছাড়া নিম্নে বর্ণিত সুরা আল-ইমরানের ১৩ আয়াত ও সুরা বাকারার ২২৩ আয়াতের উপর লেখিকা কটাক্ষপাত করেছেন, তাই পাঠকের বুঝার সুবিধার জন্য আমি উক্ত দুই আয়াতের ভাষ্য তুলে ধরছি।

পবিত্র কু'রআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বেহেশতে মুসলমানরা পবিত্র সঙ্গী বা 'জওজ' লাভ করবে। উল্লেখিত এই 'জওজ' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় নারী ও পুরুষ উভয়ে একে অপরের সঙ্গী বা জোড়ার অধিকারী হবে। সুতরাং এখানে পুরুষের যথেচ্ছাচারের কোন প্রশ্নই উঠে না।

এবার সুরা আল-ইমরানের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "মানুষের পক্ষে মনোরম ঠেকে নারীদের সহচর্যের প্রতি আকর্ষণ ও সন্তানসন্ততির; ও সোনারূপার জমানো ভান্ডারের ও সুশিক্ষিত ঘোড়া ও গবাদি পশুর ও ক্ষেত খামারের (প্রতি ভালবাসা) এসব এই দুনিয়ার (ক্ষণস্থায়ী) জীবনের উপকরণ (ও অশান্তির পরিবেশ); অথচ আল্লাহ, তার কাছে আছে (চির শান্তির আবাস বা) উত্তম নিভৃতে বিশ্রাম।

সুরা বাক্বারাহর ২২৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য এক ক্ষেত খামার (কারণ তারাই বীজ থেকে চারাগাছ ও ফলফসল উৎপাদনের ন্যায় শিশুকে গর্ভাবস্থায় থেকে পরিপুষ্টি দিয়ে ছোট থেকে বড় করে)। সুতরাং তোমরা যখন যেমন ইচ্ছা করো তোমাদের ক্ষেতখামারে গমন করো (যাতে

তাদের থেকে দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি আনন্দ উপভোগ করতে ও সুসন্তান লাভ করতে পার, ২৫:৭৪; ৩০:২১)। আর তোমাদের নিজেদের (কল্যাণের) জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা অবলম্বন করো (যাতে পাছে না পস্তাতে হয়, এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত দুই-ই যেন উজ্জলভাবে গড়ে উঠে। আর আল্লাহকে ভয়-ভক্তি করবে (অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ পালন করবে এবং তার উপদেশ ও আশিস্ সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাবে); আর জেনে রেখো-নিশ্চয় তার সঙ্গে তোমাদের মোলাকাত হবে (যখন তোমাদের কাজের হিসেব নিকেশ ও পুরষ্কার হাজির পাবে)। আর (হে মুহাম্মদ!) সুসংবাদ দাও মুমিনদের (যেহেতু সুকর্মের সুফল তারা কু'রআনের হিসাবে বহুগুণ অর্থে অবশ্যই দশ গুণ বাড়িয়ে পাবে)।

সুরা নিসার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে লেখিকা কটাক্ষ করে বলেন, সম্মানের মাত্রা সম্ভবতঃ এটুকুতেই বেশ অনুভব করা যায়। উল্লেখিত আয়াতটাই আমি উল্লেখ করছি।

"পুরুষরা নারীদের অবলম্বন (বা অভিভাবক ৪:১৩৫) যেহেতু আল্লাহ তাদের এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণীর উপরে (দৈহিক শক্তি ও সামাজিক সংঘটনে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পত্তি থেকে (স্ত্রীলোকদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) খরচ করে। কাজেই সতীসাধ্বী নারীরা (আল্লাহর প্রতি ও স্বামীদের প্রতি) অনুগতা (৩৩:৩১, ৩৫; ৬৬:৫), গোপনীয়তার রক্ষয়িত্রী, যেমন আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আর যে নারীদের ক্ষেত্রে তাদের অবাধ্যতা আশঙ্কা করো তাদের (প্রথমতঃ) উপদেশ দাও, (আর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে) শয্যায় তাদের একা ফেলে রেখো (অর্থাৎ তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করো), আর (তাতেও যদি তারা না শোধরায় তবে) তাদের (মৃদু) প্রহার করো (তবে অমানুষিক অত্যাচার করে বা গায়ে প্রহারের দাগ তুলে নয়, তির ১০ঃ১১) তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে (তালাক বা চরম ধরণের) অন্য পথ খুঁজো না (বরং তাদের গুণ গরিমার প্রশংসা করো আর দোষত্রুটিকে ক্ষমা করো)। নিঃসন্দেহ আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা মহামহিম (কাজেই তোমরা যা কিছু করো সবই যেন তাঁরই মর্জিমাফিক হয়)।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ও সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন: ইসলাম একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী সততার দলিল। তফসিরকারকের ব্যাখ্যার বদলে মূল কু'রআনকে অভিন্ন রেখে এর চেয়েও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করতে পারলে সেটিও ইসলাম সমর্থন করে। যেখানে আমি নিজেও মনে করি এখানে নারীকে প্রহার করার যুক্তি কোনভাবেই সমর্থনীয় হতে পারে না। ইসলামের মত এমন মহান ধর্মে এটি থাকতেই পারে না। এখানে যে আরবী শব্দ 'দারাবা' যাকে বেশীরভাগ তফসিরকারক প্রহার অর্থ করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে প্রহার ছাড়াও আরবীতে এই 'দারাবা' শব্দের বহুল অর্থ আছে। যেমন উপমা ছুঁড়ে মারা, উদাহরণ তৈরী করা, ভ্রমণ করা, অথবা কোথাও আঘাত করা। পুরুষ তফসিকারকরা আঘাতকেই উত্তম মনে করেছেন। বা একের অনুকরণে অন্যরাও এটি লুফে নিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় চিন্তা করলে যেখানে ইসলাম বিয়ে বা তালাকের উপর স্বচ্ছ ধারনা রেখে প্রতিটি জটিল অবস্থায় ইসলাম পথ নির্দেশ করেছে, সেখানে কোনভাবেই নারীকে প্রহার করার কথা থাকতে পারে না। কথায় আছে অতিরিক্ত টাইট দিলে রশি ছিড়ে যায়। এর বদলে আমরা উল্লেখিত যেকোন একটি অর্থকে গ্রহণ করতে পারি। উপরের আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য ভিন্ন পথ খুঁজো না। মহামহিম আল্লাহ সবই পরখ করছেন এবং মানবিক সব আচরণই উভয়ের অর্জন। পারিবারিক বিশৃংখলা তৈরী হয় উভয়ের একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণে। কিন্তু ইসলামের নীতি হচ্ছে একজন স্বামীকেও যেমন মানবিক হতে হবে একজন স্ত্রীকেও মানবিক আচরণ করতে হবে। একতরফা কেন পক্ষকেই নির্যাতন করা যাবে না। আমরা এতদিন শুনে এসেছি স্ত্রী নির্যাতনের কথা ইদানিং অনেক পুরুষ নির্যাতনের কথা শুনা ও দেখাও যায়। এক কথায় সবার উপরে আল্লাহর ফয়সালা; উভয়েই তার সৃষ্ট জীব। জবাবদিহিতার দায় উভয়েরই থাকবে। নারী বলে তাকে কখনোই আল্লাহ অবহেলা করেন নাই। তাফসিরের ব্যাখ্যায় অনেক ভুল থাকতে পারে, তাই সন্দেহ জাগলে মূল

আরবীতে ব্যাখ্যা খুঁজুন। তাকে শোধরানোর চিন্তা না করে তসলিমার মতই অনেকেই ইসলামকে এক তরফা বর্জনের অপরাধে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হচ্ছেন হয়তো ভবিষ্যতে আরো অনেকেই হবেন। স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ তসলিমার সম্মানের মাত্রাটাকে সহজ করতে আমার এ ব্যাখ্যা কু'রআনকে মাথায় রেখেই দিলাম। কিছু ঘাটাঘাটি করলে এ ব্যাখ্যা তসলিমা নিজেও দিতে পারতেন।

লেখিকার বক্তব্য নারীকে সুরা, ফলমূল ও মাংসের কাতারে উপস্থিত করা হয়েছে। সুরা ওয়াকিয়ার ১৮, ২১, ২২, ২৩ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নাকি নারীদের প্রতি অবমাননা করেছেন। পাঠক আমি আপনাদের বুঝার সুবিধার জন্য এই সুরার বেশ কিছু অংশ তুলে ধরছি। এখানে ১৬ আয়াত থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত উদ্ধৃত করছি। বেহেশতিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"তাতে তারা হেলান দিয়ে আসন গ্রহণ করবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে (৩৭:৪৪; ৫৫:৭৬)
তাদের চারদিকে (পরিচর্যার জন্য ঘুরে বেড়াবে চিরনবীন (১৪:১৭; ১৫:৪৮ তরুণেরা (৫২:২৪)।
পানপাত্র ও সোরাই নিয়ে ও নির্মল পানীয়ের পেয়ালা (হাতে করে, ৪৭:১৫)
তাদের মাথা ধরবে না (বা মাথা ঘুরবে না) তাতে, আর তাদের নেশাও ধরবে না (৩৭:৪৫-৪৭)
আর (তাদের পরিবেশন করা হবে নানান ধরণের) ফলমূল যা তারা পছন্দ করে (৫৫:৫৪)।
আর পাখির মাংস যা তারা কামনা করে।
আর (তাদের সহচর্য দেবে) আয়তলোচন হুরগণ (৫২:২০)।
(যাদের দেখতে মনে হবে খোলের ভিতরে ) আবৃত মুক্তার উদাহরণের ন্যায় (৩৭:৪৮-৪৯)
(এ সমস্তই হচ্ছে) যা তারা করতো তার পুরষ্কার।
তারা সেখানে শুনবে না কোন (আজে বাজে) খেলোকথা, না কোনো পাপবাক্য। শুধু এই কথা ছাড়া "সালাম! সালাম! (কেননা তারা দুনিয়াতে সালাম বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাই আখেরেও তারা বেহেশতের শান্তি নিকেতনে চির শান্তিতে অবস্থান করবে, (৬:১২৮; ১৯:৬২)।"

পাঠক! তসলিমা নাসরিন লড়াইতে স্রষ্টার সাথে হারলেন না জিতলেন আপনারাই বিবেচনা করুন। আমি স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসাবে আমার প্রমাণ আপনাদের সামনেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। এখানেও আমি পাঠকদের বুঝার সুবিধার জন্য বিতর্কিত ৫৮ আয়াত না এনে আগে পিছে আর একটু বাড়তি অংশও দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়।

সুরা আর রহমানঃ ৫৫-৫৮আয়াত
"কাজেই তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে (৫৫:১৩)?
তাদের মধ্যে রয়েছে সলাজ-নম্র আয়তলোচন (সহচরবৃন্দ, ৩৮:৫২) এদের আগে কোন মানুষ তাদের স্পর্শ করে নি, আর জিনও নয় (কাজেই ভালমন্দ সব রকমের মানুষের ধরাছোয়ার বাইরে তারা পূত পবিত্র রয়েছে, ৩৭:৪৮-৪৯)।
সুতরাং তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে (৫৫:১৩)?
তারা যেন (এক একটি পরম সুন্দর) চুনি প্রবাল।
অতএব তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে (৫৫:১৩)?
ভালোর পুরষ্কার কি ভালো ছাড়া অন্য কিছু হবে?"

নির্বাচিত কলামের ১৫৮ পৃষ্ঠাতে বলা হয়, "রক্ষাকবচ না থাকলে মহাভারত, রামায়ন, বাইবেলের মতো হাদিস কু'রআনও নিষিদ্ধ করতে হয়। সব দেশেই একটি আলাদা আইনে পুরাকীর্তি ও ধর্মগ্রন্থ সুরক্ষিত থাকে। রক্ষাকবচ বা সংরক্ষণের আলাদা আইন না থাকলে অশ্লীলতার দোষ নিম্নের এইসব

আয়াতকেও দেয়া যেত" সুরা বাকারার ১৮৭, ২২২, ২২৩, ২৩০ ও আল-ইমরানের ১৪ আয়াত। পাঠক, আপনাদের নিশ্চয় খেয়াল আছে যে, সুরা বাকারার ২২৩ আয়াতটি আমরা একটু আগেও আলোচনা করেছি। তাই রিপিটেশন এড়াতে আর আনছি না।

(সুরা আল-ইমরানের ১৪আয়াত)।
"(হে মুহাম্মদ! ভোগ বিলাসে অনুরক্ত এসব লোকদের) বলো "তোমাদের কি এসবের চাইতে ভালো জিনিসের খবর দেব? যারা সুপথে চলে তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে বাগান সমূহ যাদের নীচে বয়ে যাচ্ছে ঝরনারাজি, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, আর (পাবে) পবিত্র (সঙ্গী সাথী ২:২৫), আর আল্লাহর সন্তুষ্টি (৯:৭২)। আর আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের পর্যবেক্ষক।"

(সুরা বাক্বারাহর ১৮৭ আয়াত)
"(রোজা অবস্থায় যদিও পানাহার ও কামাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হয়) রোজার রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের কাছে গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা গেল (কারণ ইসলামের বিধান মতে চরম কৃচ্ছ সাধন ও সন্ন্যাসব্রত যেমন কাম্য নয় তেমনি নয় অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ; ইসলামী পথ হলো সব ব্যাপারে মধ্যম পথ অনুসরণ করা ,১ঃ৫) তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক (যার ফলে একে অন্যের যেমন আব্রু রক্ষা ও শোভাবর্ধন করে তেমনি উভয়ে পরস্পরের দেখা শোনা ও ভরণ পোষণের দায় দ্বায়িত্ব বহন করে) আল্লাহ জানেন যে তোমরা (খৃষ্টানদের দেখাদেখি রোজার সময়ে রাতের বেলাতেও স্ত্রী গমন থেকে বিরত থেকে) তোমাদের নিজেদের প্রবঞ্চনা করছিলে, তাই তিনি তোমাদের উপরে (সদয় হয়ে ) ফিরেছেন ও তোমাদের ভুলকে উপেক্ষা করেছেন। সুতরাং এখন তাদের সহচর্য ভোগ করো ও আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন (যথা তাদের থেকে সুখ শান্তি, প্রেম প্রীতি, পরিতৃপ্তি ও সুসন্তানলাভ) তা অনুসরণ করে চলো। আর (রাত্রিবেলা) আহার করো ও পান করো যতক্ষণ না (তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে ভোর বেলাতে (দিনের আলোর) সাদা কিরণ (রাতের আঁধারের) কালো ছায়া থেকে; তারপর রোযা সম্পূর্ণ করো রাত্রি সমাগম পর্যন্ত। আর তাদের (স্ত্রীদের) স্পর্শ করো না যখন তোমরা (রমজানের মাসের শেষ দশদিন) মসজিদে ইতিকাফ করো। এ হচ্ছে আল্লাহর (নির্দেশিত) সীমা, কাজেই সে সবের নিকট যেয়ো না (অর্থাৎ সীমালংঘন দূরের কথা সীমান্তের ধারে কাছেও যেয়ো না, ২:৩৫ বরং রোজার মাধ্যমে নিজেদের কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি দমন করে রাখতে শিখবে) এইভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াত সমূহ মানুষের জন্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তারা (সংযমী হয়ে) ধর্ম পরায়নতা অবলম্বন করে।

(সুরা বাক্বারাহর ২২২ আয়াত)
"(হে মুহাম্মদ) তারা তোমাকে ঋতুস্রাব (চলাকালে সহবাস) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, "এটি (অর্থাৎ ঋতুকালে সহবাস) অনিষ্টকর (কেননা এতে নারীর জরায়ুতে এন্ডোমেট্রাইটিস রোগ হতে পারে, আর এটা পরিচ্ছন্ন থাকার দিক দিয়েও অশোভন); কাজেই ঋতুকালে স্ত্রীদের (সাথে সহবাস) থেকে আলাদা থাকবে; এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ো না যে পর্যন্ত না তারা পরিষ্কার হয়ে যায় (আর সেজন্য ঋতুকালে দাম্পত্য সম্পর্কে ছেদ পড়া অবস্থায় তখন বিবাহ বিচ্ছেদ সিদ্ধ নহে, ৬৫ঃ১) তারপর যখন তারা (মাসিক ঋতুস্রাবের পরে) নিজেদের পরিষ্কার করে নেয় তখন (তোমাদের দাম্পত্য জীবনের সুফল উপভোগ করার জন্য) তাদের সঙ্গে মিলিত হও যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ ভালবাসেন তাদের যারা তাঁর (নির্দেশের) দিকে ফেরে, আর তিনি ভালবাসেন পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকারীদের।"

(সুরা বাক্বারাহর ২৩০ আয়াত)
এ আয়াতটি নির্বাচিত কলামের নির্যাতিত নারী চ্যাপ্টারে অন্যত্র তালাক প্রসঙ্গে আগেই আলোচিত হয়েছে।

এবার সুরা ইউসুফের ২২, ২৩, ৩০ আয়াতকে লেখিকা তসলিমা নাসরিন অশ্লীল আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। যার কারণে ধারাবাহিকভাবে সুরা ইউসুফের এই তিন আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মুসলিমদের অনেকেই জানেন নবী ইউসুফ কিভাবে তার মনিবপত্নী জুলেখার ছলাকলার সামনে পড়েছিলেন, এর সূত্রকথা কু'রআন ও বাইবেল স্পষ্ট করেছে। "আর যখন তিনি (নবী ইউসুফ) তার পূর্ণ যৌবনে পৌছলেন, আমরা তাকে বুদ্ধি ও বিদ্যা দান করলাম। আর এইভাবে আমরা সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার প্রদান করি" (জেনে ৩৯ঃ২)। "আর যে মহিলার গৃহে তিনি ছিলেন যে তাকে কামনা করলো তার অন্তরঙ্গতার, আর বন্ধ করে দিল দরজাগুলো ও বললে, 'এসো হে তুমি (জেনে ৩৯ঃ৭-১২) তিনি (প্রভুপত্নী যুলাইখাকে তুষ্ট করার এ আহবানে ও এই মায়াবিনী নারীর সংসর্গ লাভের এমন আকর্ষণীয় পরিবেশ সত্ত্বেও নিজের আত্মসংযম ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা বজায় রেখে) বললেন, আল্লাহ সহায় হোন! আমার প্রভু নিশ্চয়ই আমার আশ্রয়স্থল অতি উত্তম বানিয়েছেন (কাজেই সেই বাড়ীর মান ইজ্জতের প্রতি আমি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবো।) নিঃসন্দেহ তিনি অন্যায়কারীদের উন্নতি করেন না" এ দুটি ২২, ২৩ আয়াত।

"আর শহরের নারীরা (তাদের বান্ধবী যুলাইখার প্রতি দরদ মাখানো সুরে) বলাবলি করলে, 'আজীযের (বা নগর প্রধানের) স্ত্রী তার যুবক দাসকে কামনা করেছিল তার অন্তরঙ্গতার! নিশ্চয়ই সে (যুবকটি) তাকে প্রেমে অভিভূত করেছে। (কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ায়) আমরা তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়েছে" ঐ সুরার ৩০ আয়াত।

"ধর্মগ্রন্থ কখনো অশ্লীলতার দোষে দূষিত হয় না। এসব সংরক্ষণের আলাদা আইন আছে তাই মহাভারত, রামায়ন, গীতা, বাইবেল, কোরাণ, হাদিস সকল ধর্ম এবং ধর্মসংক্রান্ত রক্ষাকবচের গুণে পার পেয়ে যায় এবং আমরা তা মাথায় তুলে রাখি।" এই উক্ত কলামে নাসরিন পূর্ব আলোচিত ৮টি বড়সড় আয়াতকেই অশ্লীলতার দোষে আবদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হে পাঠক, আপনারা এর বিচার নিরপেক্ষ ভাবে করুন এবং আমার বক্তব্যের লেখিকাকে বলবো, সত্যকে সত্য বলে মেনে নেয়ার মন মানসিকতা গড়ে তুলুন; যুক্তির নামে একরাশ ভুল তথ্য দিয়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ওকালতী করায় কোন কৃতিত্ব নেই। বর্তমান যুগ সত্য ও বিজ্ঞানের যুগ। যে নিজে শক্তভাবে সত্যের অবস্থানে থাকবে না, সে বেশীদিন টিকতে পারবে না। তার ধ্বংস, মৃত্যু বা পতন অবধারিত। সকল মিথ্যার অপমৃত্যু হয়ে যেটুকু সত্য সেটুকু অবশ্যই টিকে থাকবে সবদিন। আর মিথ্যা দিয়ে কখনো সত্যের সাথে লড়াইতে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

কু'রআন কোন কল্প কাহিনীর রূপকথার বই নয়। কোন প্রেমের উপাখ্যানও নয়। বাস্তব জীবনের নানান সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে প্রতিটি জীবনের ধারা বর্ণনা এতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাস্তবের নানান জটিল সমস্যার সুন্দর সমাধান আর দিক নির্দেশনা এতে আছে। এটা মানুষের কোন আংশিক জীবন বিধান নয়। জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আছে বলেই সরল জটিল ছোট বড় অধ্যায় যেগুলো মনুষকে মোকাবেলা করতে হয় সেগুলোর আলোচনাই কু'রআনে ঠাঁই পেয়েছে। যে সব সমস্যাদি দৈনন্দিন জীবনে মোকাবেলা করা হয় সেসব সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কু'রআনের বক্তব্য কখনো অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট নয়। এটা তো আর সিনেমা থিয়েটারের পেট দুলানো নর্তন কুর্দন নয় যে, যে কোন রুচিশীল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে অশ্লীলতার দোষে চিহ্নিত করবে। তাই শ্লীল ও অশ্লীল কর্মকান্ডেরও নিশ্চয় মাপকাঠি আছে। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কথা বললে তা কখনো অশ্লীল হয় না বরং তাই শালীনতা শেখায়।

আমাদের দেশে অশ্লীলতার দিকে তসলিমা নাসরিনের চেয়ে আর কোন সাহিত্যিক এই পরিমাণ উঠতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। সেই মেয়ে আবার কু'রআনের মতো পবিত্র, পথনির্দেশক, উপদেশমূলক গ্রন্থকে অশ্লীল উপস্থাপনার উল্লেখ দেখিয়ে যে ধৃষ্ঠতাপূর্ণ রচনা তিনি লিখেছেন তাতে

সাহিত্যিক হিসাবে তার মূল্যায়ন তিনি নিজেই করে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা কোন জিনিস না বোঝার কারণে, হজম করতে না পারার জন্য দায়ী আর কিছু নয়, জ্ঞানের গভীরতার অভাব। কোন জিনিস ভাল করে বুঝে তারপর প্রয়োজনে প্রতিবাদ করা উচিত। ধর্মের নামে অনেকেই অনেক কথা বলে। তাই বলে সবার মনগড়া আয়োজন আরো আরো ধর্ম হতে পারে, পুরানো, বাতিল, সনাতনী অনেক ধর্মই আছে যেগুলোতে কালের আবর্তে স্বার্থানেষীরা মেকী জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছে যার কারণে ধর্ম তার স্বকীয়তা হারিয়েছে। শুধু মাত্র আজ অবধি কেউ এ মূল সিলেবাস কু'রআন গ্রন্থটিতে কোন বাড়তি সংযোজন করতে পারেনি বলে আজও তা পরিচ্ছন্ন এবং অবিশ্বাস্যভাবে পবিত্র। যে পবিত্রতায় ভেজাল মেশানোর স্বপ্নে নাসরিনের এত আস্ফালন। এ ধর্মটি অন্য সব ধর্ম থেকে একটি ব্যতিক্রম এজন্যই যে, এটি কোন ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর একার ধর্ম নয়, এটি বিশ্ব ধর্ম, মানবের ধর্ম, মহামানবের ধর্ম।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবী করি পৃথিবীতে এই একটি মাত্র ধর্ম এখনও টিকে আছে যা সবচেয়ে আধুনিক সংস্করণ ও উন্নত সিলেবাস। তাই পরীক্ষা পাশ করতে হলে শুনেছেন কখনো যে পুরানো সিলেবাসে পরীক্ষা দিলে পাশ করা যায়? আর হেলা ফেলা নয়, সত্যের সাথে কোলাকুলি করুন। সঠিক রাস্তা খুঁজে নিন নিজেদের স্বার্থে আর হেলাফেলা নয়, সময় থাকতে সিলেবাস আগে ঠিক করুন, তারপর পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন।

# ইসলামে বিয়ে আর উত্তরাধিকারের গ্যাড়াকলে নাসরিন

কু'রআন এমন একখানি বাস্তব জীবনের ধারা বিবরনী কিন্তু নাসরিন তার গল্পে বলেন একজন অসৎ কর্তার বাড়ীর চাকরানীর উপর কুদৃষ্টি পড়ে। তারপর উদোর পিন্ডি ভুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে কু'রআনের উপর সবদোষ দিয়ে সুরা নিসার ৩ আয়াতে, ২৪ আয়াতে, সুরা মা'আরিজ এর ২৯/৩০ আয়াত, সুরা আহযাব এর ৫০ আয়াত এর উপর ভিত্তি করে জগতের সকল দাসীকে পুরুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। তাই এবার ইচ্ছা হলেই জরিনা হোক, ফাতেমা হোক, আয়েশা কিংবা সেলিনা হোক সকলকেই তাদের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। মুসলিম নামধারী পরিবারের মেয়ে হয়েও ইসলামের, ধর্মের সর্বোপরি কু'রআন গ্রন্থটির যে অপব্যাখ্যা তিনি লেখনীতে উপস্থাপন করেছেন তা দুঃখজনক।

ভদ্রলোকের স্ত্রীর ভাষায় লেখিকা বলেন, পুরুষ মানুষকে আল্লাহ যে সুবিধা দিয়েছেন সেই সুবিধা তারা নেবে না কেন, আর সুবিধা তো দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। আমি বুঝতে পারলাম না লেখিকা একজন মুসলিম মেয়ে হয়েও তার পরিবার থেকেও কি তিনি কোন ইসলামী কানুন আয়ত্ব করতে পারলেন না, দুনিয়ার সব গাল গল্পকে তিনি ধর্মের অঙ্গ বলেই মেনে নিয়েছেন। এমন যদি হতো তাহলে সুবিধাবাদী এ পুরুষ সমাজের প্রত্যেকটি ঘরে মেয়েরা আর কাজের জন্য দাসী রাখতো না আর সব দাসীরাই সব পুরুষের নাগালেই থাকতো। তাহলে আমি বলবো ধন্য আমাদের পুরুষ জাতি! কু'রআন যদি এতো সুবিধা তাদের দিয়ে থাকে তবে তারা প্রত্যেকে কেন সে সুবিধা থেকে দূরে থাকছে? নাসরিন আপনি আপনার বাবা, চাচা, দাদাদের প্রশ্ন করতেন কেন ওরা ওরকম সুযোগ নিলেন না? সমাজের এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কুকীর্তির কথা কেন আপনি বলবেন? সকল ভদ্রলোকেরই তো এ রকম হবার কথা ছিল।

তর্কে তর্কে বেলা অনেক গড়ালো। নীচে আমি ঐ আয়াত গুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা নিয়ে আপনি ধর্মকে খেলো করতে চাইছেন।

(সুরা নিসার ৩ আয়াত) "আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে তোমরা এতীমদের (স্বার্থরক্ষার) প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে পারছো না, তা হলে স্ত্রী লোকদের মধ্যের (অনাথা বা বিবাহযোগ্যা মেয়ে বা এতীম ছেলেমেয়ের মাতা) যাকে তোমাদের ভাল লাগে তাকে বিয়ে করতে পার (যাতে তোমরা ওদের কল্যাণের জন্য আগ্রহী হতে পার এবং এ ধরণের শুভ উদ্দেশ্যে তোমরা একই সময়ে) দুই বা তিন বা চার (জনকে বিয়ে করতে পার), কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে (নতুন পত্নী পেলে আগেকার স্ত্রীর প্রতি) তোমরা সমব্যবহার করতে পারবে না (৪:১২৯), তা হলে একজনকেই (নিয়ে থাকো) অথবা (স্বাধীন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার সংগতি না থাকলে তোমরা বিয়ে করতে পার) তোমাদের ডানহাত যাদের ধরে রেখেছে (অর্থাৎ শক্ত মুষ্টিতে ধরে রাখা তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের, ৪:২৫) এটিই বেশী সঙ্গত যেন তোমরা (ন্যায়সঙ্গত আচরণ থেকে) সরে না যাও।"

(সুরা নিসার ২৪ আয়াত) "আর স্ত্রীলোকদের মধ্যের সধবা যারা (তারাও অন্যের বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় তোমাদের জন্য পুনর্বিবাহে অবৈধ) তবে তোমাদের ডানহাত যাদের ধরে রেখেছে তাদের ব্যতীত (অর্থাৎ যাদের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বন্দিরূপে তোমাদের হাতের মুঠোয় ধরে এনেছে তাদের আগের স্বামীরা তালাক না দিলেও তোমরা তাদের বিয়ে করে দাসত্বে পরিণত করার পরিবর্তে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারো) (এ হচ্ছে) তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিধান। আর এদের বাইরে (অন্য সব স্ত্রীলোককে) তোমাদের জন্য বৈধ করা গেল যদি তোমরা চাও তোমাদের ধনদৌলত দিয়ে (মোহরানা সাব্যস্ত করে) বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে,

ব্যভিচারের জন্য নয় (৫:৫ বা প্রাক ইসলামিক যুগের আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত 'মুতাহ' বা সাময়িক বিবাহের জন্য নয়, বুখারী ৬৪:৪০)। অতএব তাদের মধ্যের যাদের থেকে তোমরা (দাম্পত্য জীবনের ) সুফল পেতে চাও তাদের নির্ধারিত মোহরানা তাদের প্রদান করো। আর তোমাদের জন্য দূষনীয় হবে না (মোহরানা) নির্ধারিত হবার পরে তোমরা (পরবর্তীকালে তার পরিমান কমাবার বা বাড়াবার জন্য) যাতে পরস্পর সম্মত হও। নিঃসন্দেহ আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা পরমজ্ঞানী।"

(সুরা আহযাব ৫০ আয়াত) "হে প্রিয় নবী! আমরা তোমার জন্য তোমার (বৃদ্ধকালে ৫৪ থেকে ৬০ বছর বয়সে বিয়ে করা, চারের উর্দ্ধ পড়া (নিসার ৩ আয়াতে সব কজন স্ত্রীদের বৈধ করেছি যাদের তুমি তাদের দেনমোহর আদায় করেছ (কেন না যুদ্ধে শহীদ হওয়া তোমার প্রিয় সহচর বৃন্দের বিধবা স্ত্রীদের বিয়ে করে আশ্রয় দেওয়া এবং তিনটি ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের প্রতি মৈত্রতা স্থাপনের জন্য ওদের গোত্রের তিনজন বিধবাকে স্ত্রীর মর্যাদা দান তোমার জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল), আর (ধার্য করেছি সেই বন্দিনীদের) যাদের তোমার ডানহাত (শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে তাদের মধ্য থেকে যাদের আল্লাহ তোমাকে যুদ্ধের দান রূপে দিয়েছেন আর তেমন বন্দিনীদের বিয়ের দেনমোহর হবে বন্দীত্ব থেকে তাদের মুক্তিদান) আর (বিবাহের জন্য বৈধ করেছি) তোমার চাচার মেয়েদের ও তোমার ফুফুর মেয়েদের এবং তোমার মামার মেয়েদের ও তোমার খালার মেয়েদের যারা তোমার সঙ্গে (মক্কা ও মদীনাতে) হিজরত করেছে, আর কোন মুমিন নারী যদি সে নবীর কাছে (মোহরানার দাবী ছেড়ে দিয়ে) নিজেকে সমর্পন করে (এবং) যদি নবীও তাকে বিবাহ করতে চান এটি বিশেষ করে তোমার জন্য (বৈধ থাকলো এই জন্য যে তোমার বিবাহগুলোর মাধ্যমে যাতে বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয়) (অন্যান্য) মুমিনগণকে বাদ দিয়ে (কেন না তাদের জন্য একই সঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয় ৪:৩)।"

(সুরা আহযাব এর ৫২ আয়াত) "এরপর (অর্থাৎ বর্তমান সপ্তম হিজরীর পরে যখন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যুদ্ধের জটিলতা দূর হয়ে গেছে তখন আর) নারীরা তোমার জন্য (স্ত্রীত্বে গ্রহণের উদ্দেশ্যে) বৈধ নয়, আর তাও নয় যে তাদের স্থলে অন্য স্ত্রীদের তুমি বদলে নিতে পারবে, যদিও বা তাদের সৌন্দর্য তোমাকে তাজ্জব বানিয়ে দেয়--তোমার ডানহাত যাদের (বিবাহ বন্ধনে ইতিপূর্বে) ধরে রেখেছে তাদের ব্যতীত। আর আল্লাহ হচ্ছেন সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী (সুতরাং কেউই আল্লাহর প্রহরা ছাড়িয়ে যেতে পারে না (১৭: ৭৩-৭৫)।"

অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন ও দাসদাসীর উপর কু'রআন থেকে দু'টি উদ্ধৃতিঃ---"মুসলমান দাসী রমনীও কাফের রমনী হতে শ্রেয়, যদিও তোমাদের চিত্তাকর্ষন করে। আর মুসলমান পুরুষ দাসও কাফের পুরুষ হতে শ্রেয় যদিও কাফের পুরুষ তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে" (সুরা বাকারার ২২১আয়াত)। "অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ" (বনি ইসরাইল ৩২ আয়াত)।

প্রাক-ইসলামিক যুগে দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল; কালে ইসলামই মানুষকে দাসপ্রথার এই কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করে। আর অনেক দাস ইসলামে নিজের স্বকীয়তায় উজ্জ্বলতর অবদান রেখে গেছেন। হযরত বেলাল ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস, ইসলামে তার মর্যাদা অনেক উঁচুতে। আমরা অনেকেই হযরত বেলালকে জানি কিন্তু ইসলামে তাকে কৃতদাস হিসাবে দেখা হয় না কখনোই। ভারতবর্ষের কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইলতুতমিশ এরাও দাস বংশেরই লোক ছিলেন। সালমান ফারসী, সুহায়র রুমী এরা সবাই কৃতদাস ছিলেন। প্রাথমিক ইসলামে দেখা যায় অনেক বিদুষী নারীরাও দাসীদের মধ্যে ছিলেন। ইসলামের উদারতার হাতছানিতে লেখাপড়ার জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সবার জন্য নির্ধারণ করে দেয়ার প্রেক্ষিতে অনেক দাসী নারীও দাসপ্রথার যুগে অনেক সম্মানিতা ছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনা মুশরিক নারী থেকে বিশ্বাসী সাত্ত্বিক মুসলিম দাসীই উত্তম। প্রাক-ইসলামিক যুগে দাসদাসীরা ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে

মুশরিকদের থেকে অনেক উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কুরাইশদের অত্যাচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে প্রায় প্রতিটি মুসলিম পরিবারের নারীদের অবস্থান বিপন্ন হয়ে পড়ে যার প্রেক্ষিতে ঐ সময় দুই, তিন, বা চার পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে অন্যথায় এক বিবাহই উত্তম এবং এও বলা হয়েছে যে তোমরা ব্যবহারে সমতা রাখতে পারবে না।

নিসা, অর্থ 'নারী' নারীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের অনেক কিছুই এই সুরাতে আলোচিত হয়েছে। আল-মা'আরিজ হল 'উন্নয়নের পথ'। এই সুরারও ভাষ্য পূর্বে দেয়া হয়েছে। দাসদাসীর যে বিধান সেই দাসপ্রথার যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল, পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই কু'রআনের আয়াত থেকে বুঝতেই পারছেন। আল্লাহ স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছেন "যদি তোমরা চাও, তোমাদের ধনদৌলত দিয়ে (মোহরানা সাব্যস্ত করে) বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে, ব্যভিচারের জন্য নয়।" এত স্পষ্ট কথার পর সমাজপতিদের মনগড়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাসরিনের আস্ফালনে অবশ্যই দারুণ মর্মবেদনা অনুভব করেছি এই জন্য যে নাসরিন আসল শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে নকল শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়তে চাচ্ছেন বলে। তাছাড়া ইসলামের আইন কানুন শুধু কু'রআন ছাড়াও এসব সাধারণ জিনিস আমাদের সমাজে পালন করা হয় স্বাভাবিকভাবেই। কোন ভদ্রলোকের এরকম আচরণের জন্য ঐ নষ্ট লোক বা ঐ রকম সমমনা গোষ্ঠীর লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দরকার ছিল। ঐ লোককে আমি ভদ্রলোক না বলে নষ্ট লোক বলেই চিহ্নিত করবো। নাসরিন ও তার স্বগোত্রীয় সমমনা লোকদের বলবো আমার উদ্ধৃত উপরোক্ত আয়াতগুলোকে মন দিয়ে পড়ে বুঝে নিতে, যাতে কু'রআন সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়। আর এসব ভুল থিওরী কু'রআন গড়ে দেয় নি; মানুষরা নিজেরাই নিজেদের সুবিধামত কুকর্ম করার সুযোগে ধর্মকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু শিক্ষাই একমাত্র অস্ত্র যা এসবের সকল বিভ্রান্তি ঘোচাতে পারবে। আর কু'রআন এমন একখানি গ্রন্থ যা একটা গবেষনামূলক তথ্য নির্ভর গ্রন্থ বটে! যা দিয়ে সব কিছুর সমাধান সম্ভব।

সুরা মা'আরিজ ২৯/৩০ আয়াত
আর যারা নিজেরাই তাদের আঙ্গিক কর্তব্যাবলী সম্পর্কে যত্নবান (অর্থাৎ কামলালসা দমনে সচেষ্ট ২৩:৫) তবে নিজেদের দম্পতি অথবা তাদের ডানহাত যাদের ধরে রেখেছে তাদের ছাড়া (৪:২৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কেন না, সে ক্ষেত্রে তারা (শ্লীলতাহানির জন্যে ) নিন্দনীয় নহে ২৩:৬)। "আর তোমাদের মধ্যে যার (তেমন) আর্থিক সংগতি নেই যে (যথাযথ মোহরানা আদায় করে ও সুষ্ঠভাবে ভরণ পোষণের ব্যয়ভার বহন করে) বিশ্বাসিনী স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে পারে, সে তবে (বিয়ে করুক তোমাদের ডান হাত ধরে রাখা বিশ্বাসিনী কুমারীদের মধ্য থেকে (যেহেতু তাদের মোহরানার পরিমাণ ও ভরণ পোষণের মানদন্ড স্বাধীন নারীর চেয়ে নীচে) আর আল্লাহ ভাল জানেন তোমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে, তোমরা একে অন্য থেকে (উদ্ভুত, তাই দাসীরাও তোমাদের মতই মানুষ) কাজেই (নিঃসংকোচে) তাদের বিয়ে করো তাদের মনিবের অনুমতি নিয়ে (আর তোমরা স্বয়ং সেইসব দাসীর মনিব হলে তেমন অনুমতি নেবার প্রশ্ন উঠে না) আর তাদের মোহরানা তাদের দাও সুষ্ঠভাবে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে, ব্যভিচারের জন্য নয় আর, রক্ষিতারূপে গ্রহণ করেও নয়। অতএব যখন তাদের (মর্যাদার সাথে) বিবাহ বন্ধনে আনা হয় তারপর যদি তারা অশ্লীল আচরণ (ব্যভিচারও ) করে তবে (তাদের নৈতিক মান নীচু স্তরের থাকায়) তাদের জন্য হচ্ছে স্বাধীন নারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক ৪:১৫, ২৪:২) এ (ঝি দাসী বিবাহের পরামর্শ) হচ্ছে তোমাদের মধ্যে তার জন্য যে (অবিবাহিত থাকলে যৌন তাড়নায়) পাপে পড়ার ভয় করে। আর যদি তোমরা (আর্থিক স্বচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত রিপু দমন করে) ধৈর্য্য ধরো তবে সেটি তোমাদের জন্য বেশী ভাল। আর আল্লাহ (পদস্থলন থেকে) ত্রাণকর্তা, অসীম কৃপানিধান।"

## উত্তরাধিকারঃ

১৯৯৪ সালে তসলিমা নাসরিন চরম ইসলাম ও বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য রাখায় দেশপ্রেমিক জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তখন তসলিমা নাসরিন আত্মগোপন করেন। আত্মগোপনের পূর্বে জার্মানীর একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকার ঢাকা প্রতিনিধি তসলিমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। পত্রিকাটির নাম ডেয়ার স্পিগেল এবং ঢাকা প্রতিনিধির নাম ব্রিগিট সোয়ার্চ। এই সাক্ষাৎকারটি ডেয়ার স্পিগেলে প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালের ১৩ই জুন তারিখে। ব্রিগিট সোয়ার্চের একটি প্রশ্নের উত্তরে নাসরিন সরাসরি বলে ফেলেন, "আমার বিশ্বাস কু'রআনের অনেক অংশ ভুল। যার দরুণ আমাদের সমাজে নারীরা নির্যাতীত। যেমন পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ কেন একজন পুত্র কন্যার চেয়ে বেশী পাবে? কেন ইসলামী শরিয়ত স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার হরণ করেছে।

তাদের প্রশ্নের জবাবে তসলিমা বলেন, "আমাদের পথ নির্দেশনার উৎস হিসাবে কু'রআনের বৈধতা আর বেশী দিন চলতে পারে না। ১৪০০ বছর পূর্বের জঘন্য হানাহানি থেকে পরিত্রাণের জন্য কু'রআনের প্রয়োজন ছিল। আমরা বর্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি উন্নত বিশ্বে বাস করছি। কু'রআন এখন নিষ্প্রয়োজন। কু'রআন বর্তমানে প্রগতি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।" ডেয়ার স্পিগেল প্রশ্ন করেন, আপনি কি চান যে, কুরআন বিলোপ করা হোক"। নাসরিনের উত্তর, "একটি সভ্য সমাজে ধর্মীয় পুস্তকের প্রয়োজন নেই। এগুলো দেশে নারীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অধিকার হরণ করেছে" (তসলিমাঃ অবগুণ্ঠন উন্মোচন, আসিফ আরসালান, ১৫ই অক্টোবর, দৈ সংগ্রাম)।

নাসরিন তার নির্বাচিত কলামে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের প্রতিও বৈষম্যমূলক অপবাদ তুলেছেন তার বইএর ৪৬ পৃষ্ঠা ও ১৩৮ পৃষ্ঠায়। নীচে নির্বাচিত কলামের ১৩৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিঃ "মুসলিম উত্তরাধিকারী আইন মেয়েদের অসম্মান করবার নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েছে। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পান, তাদের কোন সন্তান না থাকলে স্বামী দুই ভাগের এক ভাগ পান অথচ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পান, তাদের কোন সন্তান না থাকলে স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ পান। স্ত্রী এবং স্বামীর ক্ষেত্রে সম্পত্তি বন্টনের এমন অসাম্য কেন? অসাম্য কেন সন্তানের ক্ষেত্রে? ছেলে ও মেয়ে থাকলে মেয়ে ছেলের অর্ধেক পান। মৃত বাবা ও মায়ের অন্যান্য উত্তরাধিকারীর অবর্তমানে একমাত্র ছেলে তার বাবা ও মায়ের সব সম্পত্তির মালিক হন এবং এক্ষেত্রে একমাত্র মেয়ে হলে তিনি মৃত বাবা মায়ের সম্পত্তির দুইভাগের এক ভাগ পান। স্বামী এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে, ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে সম্পত্তির এমন অসম বন্টন কেন?"

এবার কু'রআনে উত্তরাধিকারের আয়াত সম্বলিত সুরা নিসার ১১/১২ আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি---
"আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন (উত্তরাধিকারের প্রথম পর্যায় হিসাবে) তোমাদের সন্তান সন্ততি সম্পর্কে (সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করতে) এক বেটা ছেলের জন্য দুই মেয়েছেলের সমান অংশ (নির্ধারিত হল, যদিও বা ছেলেমেয়েদের কেউ উত্তরাধিকারী রেখে ইতিপূর্বে মারাও গিয়ে থাকে) তবে যদি তারা সব মেয়ে হয়, দুই মেয়ের উর্দ্ধে (অথবা দুইজন মাত্র মেয়ে, ৪:১৭৭, এবং তারাই একমাত্র উত্তরাধিকারী) তবে তাদের জন্য (নির্ধারিত হল) সে যা রেখে গেছে তার দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি সে একটি মাত্র মেয়ে হয় তবে তার জন্য অর্ধেক (সম্পত্তি থাকবে)। আর (উত্তরাধিকারের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে) তার পিতামাতার জন্য তাদের দুজনার প্রত্যেকের জন্য সে যা রেখে গেছে তার ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি তার সন্তান থাকে কিন্তু তার যদি সন্তান না থাকে ও তার ওয়ারিশ হয় (শুধু) পিতামাতা তবে তার মাতার জন্য (প্রাপ্য হচ্ছে) এক তৃতীয়াংশ; কিন্তু যদি তার (মৃত ব্যক্তির) ভাইরা থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ, কোন ওসিয়ত নামাতে উইল করে থাকলে বা দেনা থাকলে তা আদায়ের পরে (কেননা দেনার ভার ও উইলের দাবী ওয়ারিশানকেই বইতে হবে এবং তেমন দায় দায়িত্ব আগে ভাগে মিটমাট করে ফেলা চাই)। তোমাদের

পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমরা জানো না এদের কে তোমাদের কাছে ফায়দার দিক দিয়ে বেশী নিকটতর (তাই তাদের প্রত্যেককে ন্যায্য পুরাপুরি আদায় করা চাই) এ আল্লাহর তরফ থেকে বিধান। নিঃসন্দেহ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞাতা, সর্বজ্ঞানী।

"আর (উত্তরাধিকারের তৃতীয় পর্যায় হিসাবে) তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে যায় তার অর্ধেক তোমাদের জন্য যদি তাদের কোন ছেলেপেলে না থাকে, কিন্তু যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমাদের জন্য (সাব্যস্ত হলো) তারা যা রেখে গেছে তার এক চতুর্থাংশ কোন অসিয়ত নামায় তারা উইল করে থাকলে বা দেনা থাকলে তা আদায়ের পরে (কারণ ইসলাম নারীকে পুরুষের ন্যায় সম্পত্তি আদান প্রদান করার সমান অধিকার দিয়ে রেখেছে, কাজেই তারা যে সব দায় দায়িত্ব রেখে গেছে তা ওয়ারিশদের আগেভাগে মিটিয়ে ফেলতে হবে)। আর তাদের (স্ত্রীদের) জন্য (প্রাপ্য) যা তোমরা রেখে যাও তার এক চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি তোমাদের ছেলেপিলে থাকে তবে তাদের জন্য (নির্ধারিত প্রাপ্য) যা তোমরা রেখে গেছ তার আটভাগের এক ভাগ কোনো ওসিয়তনামায় তোমরা উইল করে থাকলে বা দেনা থাকলে তা আদায়ের পরে। আর যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে নিঃসন্তানভাবে (পিতামাতা থাকা অবস্থায় ৪:১৭৭) উত্তরাধিকার করতে হয় ও তার এক ভাই বা এক বোন থাকে তবে তাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্য (সাব্যস্ত হল) ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তারা (সংখ্যায়) এর চেয়ে বেশী (অর্থাৎ দুই বা ততোধিক) হয় তবে তারা (সমবেতভাবে) হবে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার। কোনো ওছিয়তনামায় তারা উইল করে থাকলে বা দেনা থাকলে তা আদায়ের পরে অবশ্য তেমন দায় দায়িত্বে ওয়ারিসানের) কোনো ক্ষতি না করে; এ হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে বিধান। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞাতা, অতি অমায়িক"।

মুসলিম আইনে উপরোক্ত বিধানই সম্পত্তি বন্টনে আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত ব্যবস্থা। একটা মুসলিম মেয়ে বাবার বাড়ীতে ও স্বামীর বাড়ীতে উভয় স্থানেই তার অংশ বিদ্যমান। কার্যত দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীরা মুসলিম উত্তরাধিকার থেকে অনেক উদাহরণ নিয়ে বঞ্চিত নারীদের সম্পত্তি বন্টনে উদ্যোগ নিয়ে সংশোধন করেছেন। কিন্তু একটা ছেলে সারাজীবন স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়িত্ব একজন ছেলের উপরই বর্তায় কিন্তু পক্ষান্তরে মেয়ে ছেলের কোন ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য নয়। একবার এক মাকে বলতে শুনেছিলাম যে আমার এক ছেলে এক মেয়ে আমি দুজনকেই সমানভাবে ভাগ করে দেবো। এটাতে মেয়েটি নিঃসন্দেহে লাভবান হলেও ছেলেটি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে কারণ এখানে সমতার ভিত্তিতে ছেলে বঞ্চিত হলো কারণ ওদিকে ছেলেকে আজীবন সমূহ দায় দ্বায়িত্ব বহন করে যেতে হবে। মেয়ে স্বাধীনভাবে তার টাকা পয়সা সম্পত্তি খরচ ও অর্জনের অধিকার রাখে। আল্লাহর এই ইসলামী বন্টন সর্বাংশে সমর্থিত হিসাবেই মুসলিম আইনে গৃহীত হয়ে আছে। আর আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন যে, "তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমরা জানো না এদের কে তোমাদের ফায়দার দিক দিয়ে বেশী নিকটতর।"

আমাদের ভালমন্দ সেই আল্লাহর হাতেই সমর্পিত। কু'রআনের নির্দেশিত বিচক্ষন যুক্তি নির্ভর জীবন ব্যবস্থা পূর্নাঙ্গভাবেই অবতীর্ন হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের মত নতুন সংস্করণের প্রয়োজন কু'রআনে নেই। কেয়ামত পর্যন্ত এটা সংরক্ষিত আকারে থাকবে। এ ব্যাপারে কু'রআনেরই আয়াত সন্নিবেশ করে উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করার ইচ্ছা পোষণ করছি।

"যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করে, তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করে" (সুরা আরাফ ৮৫ আয়াত)। "আর নিশ্চয়ই আমরা তাদের জন্য নিয়ে এসেছি একখানা কিতাব (অর্থাৎ এই কু'রআন) যাতে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি (সঠিক) জ্ঞান দ্বারা, এক পথনির্দেশ ও করুণা যারা বিশ্বাস করে তেমন লোকের জন্য" (সুরা আরাফ ৫২ আয়াত)। আল্লাহ তার সৃষ্ট মানুষের থেকে দূরে থাকেন না,

এটি তিনি স্পষ্ট করেছেন তিনি কণ্ঠশিরা থেকেও নিকটে (সুরা বাক্কারাহ ১৮৬ আয়াত)। আমরা এটিও জানি আল্লাহ মানুষকে তার বোঝার বেশী চাপিয়ে দেন না (সুরা বাক্কারাহএর ২১৬ আয়াত)।

# রসুল (সঃ) এর বিয়ে

হযরত মোহাম্মদ (সঃ)এর বিয়ে উপলক্ষ্যে ১৭২ পৃষ্ঠায় নির্বাচিত কলামের নাসরিনের উদ্ধৃতিটুকু দিলাম----"ইসলাম ধর্মে পুরুষের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার নিয়ম প্রচলিত। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) চৌদ্দটি বিয়ে করেছিলেন। মহানবীর আদর্শ ইসলাম ধর্ম মতাবলম্বীদের অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু যে অন্ধকার যুগে, যে বর্বরতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ও ব্যাভিচারের যুগে হযরত মুহাম্মদ বহুবিবাহ ব্যবহারে বাধ্য হয়েছিলেন, তা উল্লেখ করে এ যুগের বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবিগণ বহুবিবাহ রোধ কল্পে অনায়াসে উদ্যোগী হতে পারেন।"

অনেক পাঠকের মনেই হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর চৌদ্দটা বিয়ে সম্পর্কে নানান প্রশ্ন উঁকিঝুকি মারতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের অনেকেই জানেন হয়তো, আবার অনেকে বিষয়টা ভাল করে হয়তো তলিয়ে দেখেন না। কারণ আমার মনে পড়ে আমার অঞ্চল কিছুটা হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চল ছিল, আমার স্কুল, কলেজ জীবনে অনেক সহপাঠি হিন্দু ছিল, তাই যখন তখন সুযোগ পেলেই ওরা আমার নবীকে খুব কটাক্ষ করে কথা বলতো, জ্ঞানের অজ্ঞতাহেতু অনেক সময় চুপ করে গেছি এবং আমারও খারাপ লাগতো তাই পরবর্তীতে এব্যাপারে যথেষ্ট চর্চাও করেছি। তবে এখন বুদ্ধি ও মননে কিছুটা লেখাপড়ারও গুণে যথেষ্ট ধীশক্তি এব্যাপারে বেড়েছে, তাই এখন, আমার নবীকে কেউ কিছু কটাক্ষ করলে আমিও তার জবাব দেবার চেষ্টা করি।

যে যুগে একজন নারীর ১০০টা স্বামী থাকতো আবার একজন পুরুষেরও ১০০টা স্ত্রী থাকতো, সমাজে কোন বাছবিচার ছিল না; সেই বর্বর জাতিকে বাগে আনা চাট্টিখানা কথা নয়, সম্ভবতঃ ঐ সময় ঐ অঞ্চল বর্বরতায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল বলেই সেখানে আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমকেই প্রেরণ করেন। আর সমাজের যেটুকু অনাচার এর উপর ভিত্তি করে আজও টিকে আছে এটা রোধ করার একমাত্র অস্ত্র হলো শিক্ষা ও কু'রআনের সঠিক বাস্তবায়ন। কু'রআনের উপর যথেষ্ট চর্চা ও গবেষণা হলে এসব ত্রুটি সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। যাক্ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের এই অংশের আলোকে নীচে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করছি।

মুসলিমদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর স্ত্রীদেরকে সাদাসিধা জীবন যাপন করতে ও অন্যথায় ভোগ্যবস্তু নিয়ে বিদায় হতে বলা হয়েছে এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তাদের মধ্যে কোন অশুভ আচরণ দেখা গেলে অন্যের থেকে তারা দ্বিগুণ শাস্তি পাবেন। বস্তুতঃ যে সব মহিলা বিভিন্ন কারণে রসুলের শেষ বয়সে তার পরিবারভুক্ত হয়ে ছিলেন তাদের কেউই ভোগবিলাসের বা অশালীন আচরণের পথ ধরেন নি।

সুরা আহযাবে যয়নবের সাথে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বিবাহ প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। যায়েদ ছিলেন হযরতের সেবায় নিয়োজিত একজন ক্রিতদাস এবং তিনি ছিলেন একজন অগ্রনী মুসলিম। মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) যায়েদকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাকে নিজের পালক পুত্ররুপে গ্রহণ করেছিলেন। হযরতের ইচ্ছা ছিল তার ফুফাতো বোন যয়নবকে যায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিতে, অথচ যয়নবের ও তার ভাইএর ইচ্ছা ছিল হযরত নিজে তাকে বিয়ে করুন (৩৬ আয়াত দ্রষ্টব্য) রসুলের আগ্রহে ও চেষ্টায় যয়নবের বিয়ে যায়েদের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। কিন্তু যায়েদ ও যয়নবের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ফলে হযরতের উপর নৈতিক দায়িত্ব বর্তালো ক্রীতদাসের তালাকপ্রাপ্তা যয়নবকে সামাজিক

অবমাননা থেকে মুক্তি দিয়ে নবীর পত্নীর মর্যাদা দান (৩৭ আয়াত)। ইসলামী বিধান অনুযায়ী পোষ্য পুত্রদের ও রক্ত সম্পর্ক তাদের আপন পিতামাতার সঙ্গে, পালক পিতার সঙ্গে হচ্ছে ধর্মভাই ও বন্ধুসুলভ সম্পর্ক (এই সুরারই ৪-৬ আয়াত) পালক পুত্র ও ধর্মভাই আপন ঔরসজাত পুত্র ও সহোদর ভাইএর সমতুল্য নয়। কাজেই পালক পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে পালক পিতা পত্নীত্বে গ্রহণ করতে পারেন। যয়নবের ঘটনাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ রক্ত সম্পর্কের প্রাধান্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

হযরতের গায়ে কলঙ্ক লেপনকারী নিন্দুকেরা বলতে চায় যে মোহাম্মদ (সঃ) যয়নবকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে যায়েদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তার যদি তেমন বাসনা থাকতো তাহলে ক্রীতদাসের সঙ্গে যয়নবের বিয়ে না দিয়ে নিজেই তাকে গ্রহণ করতে পারতেন। আসল ঘটনাটি একটু তলিয়ে দেখলেই নিন্দুকদের মিথ্যাবাদ যে কত নীচ তা সহজেই ধরা পড়ে যায়। হযরত মোহাম্মদের একাধিক বিবাহ নিয়েও নিন্দুকেরা তাকে ইন্দ্রিয় পরায়ণ নামে কলঙ্কিত করতে চায়। অন্য মুসলিমদের পক্ষে একসঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা নিষেধ; কিন্তু হযরতের জন্য চারের অধিক সংখ্যক স্ত্রী বহাল রাখার বিশেষ অনুমতি রয়েছে (৫০ আয়াত)। এই নিয়েও নিন্দুকদের কাঁদা ছোঁড়াছোঁড়ির অন্ত নেই। কাজেই হযরত মুহাম্মদের বিবাহিত জীবন নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তার জীবনকালকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত জীবন যাপন। স্মরণ রাখা উচিত, আরবদেশে সে যুগে নৈতিকতার মান খুবই নীচে নেমে গিয়েছিল এবং আরবের যুবকেরা নারীধর্ষণ ও লাম্পট্যে গর্ব অনুভব করতো। তেমন সামাজিক পরিস্থিতিতে ও গরম প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় সুদীর্ঘ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে পূতপবিত্র জীবনযাপনের নজীর দেখিয়ে গেছেন তার তুলনা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ৫৪ বছর বয়স পর্যন্ত একই মহিলার সাথে বিবাহিত জীবন যাপন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পঁচিশ বছর বয়সে তার চেয়ে পনেরো বছরের বড় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক বিধবা মহিলা হযরত খাদিজাকে বিয়ে করেন। খাদিজা পয়ষট্টি বছর বয়সে যখন মারা যান তখন হযরতের বয়স পঞ্চাশ বছর। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার যৌবনের সুবর্ণ দিনগুলি এই এক এবং একক প্রৌঢ়া মহিলাকে নিয়েই অতিবাহিত করেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলে মহানবী কোনো ক্রমেই ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন না। হযরত খাদিজার মৃত্যুর পর সাংসারিক প্রয়োজনে তিনি সাউদাহ নামে এক বয়স্কা বিধবাকে বিবাহ করেন। তার একমাত্র কুমারী স্ত্রী আবুবকরের কন্যা হযরত আয়েশার সাথে বিবাহ পঞ্চান্ন বছর বয়সে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কাজেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার সারাটা যৌবনকাল একই স্ত্রী নিয়ে কাটিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ পঞ্চান্ন থেকে ষাট বছর বয়সকালে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ। মদীনায় হিজরতের পরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে প্রায়ই বিভিন্ন যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হয়। হযরতের অনেক সাহাবা বা সহচরবৃন্দ এসব যুদ্ধে মারা গেলে তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বভাবতই হযরতের ও তার জীবিত সহচরদের উপরেই বর্তায়। এই কারণেই একমাত্র এতীম সন্তান ও আশ্রয়হীনা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পবিত্র কু'রআনে দুই বা তিন বা চার পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া আছে (৪:৩)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে হয় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে:

(১) বদরের যুদ্ধে হযরত উমর এর কন্যা হাফসা বিধবা হয়ে যাওয়ায় তাকে যথাক্রমে হযরত উসমান ও হযরত আবুবকরের আশ্রয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত হাফসা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর স্ত্রীরূপে আশ্রয়লাভ করেন।

(২) ওহুদের যুদ্ধে যয়নবের স্বামী আব্দুল্লাহ শহীদ হওয়ায় তিনি হযরতের পরিবারভুক্ত হয়ে আশ্রয় পান।

(৩) উম্মে সালমাহ বিধবা হওয়ার পরে হযরত তাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করেন।

(৪) মহানবীর ফুফাতো বোন তথা অভিজাত মহিলা যয়নবকে ক্রীতদাস যায়েদ তালাক দিয়ে দেওয়ায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন।
(৫) উম্মে হাবিবাহ প্রাথমিক কালের মুসলিম মহিলা আরববাসীর অত্যাচারে স্বামীসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেই মহিলা বিধবা হয়ে গেলে হযরতের আশ্রয়লাভে নিজের দুঃখ মোচন করেন।

উল্লেখিত পাঁচটি বিবাহ করার প্রয়োজন পড়ে সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবেলায়; এসব বিয়ে সখের বিয়ে নয়। এছাড়া তাকে তিনটি পলিটিক্যাল বিয়ে করতে হয়। বিভিন্ন বিধর্মী গোত্রের সাথে বৈরীভাব দূর করে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্যেশ্যে তেমন তিনটি গোত্রের তিনজন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। তারা হলেন জুয়াইরিয়া, মায়মুনা ও সুফিয়া। এই তিনটি বিয়ে সম্পাদিত হয় হযরতের উনষাট ও ষাট বছর বয়সে।

বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলায় সম্পাদিত বিয়ের কারনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শেষ বয়সে তার পরিবারে একসঙ্গে নয়জন পত্নীর সমাবেশ হয়। এই নয়জন মহিষী ভোগবিলাস তথা বৈষয়িক আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে মহানবীর সহচর্য কামনা করেছিলেন (২৮আয়াত)। এই সব বিয়ের মাধ্যমে রসুলের চরিত্রের মানবতাবোধ, দুরদর্শিতা; প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহারের আদর্শ ও অন্যান্য গুণাবলী ফুটে উঠেছিল।

চতুর্থতঃ ষাট বছর বয়সের পর নতুন কোন বিবাহ না করা, হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে যখন আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, বিনা রক্তপাতে মক্কার শাসনভার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাতে এলো, তখন সারা দেশে শান্তিময় স্বর্গরাজ্য কায়েম হলো। আর তাই ষাট বছর বয়স থেকে তেষট্টি বছরে তার ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত আর কোন বিয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

সেই পুরানো বিষয়টি যা নিয়ে নাস্তিকদের ও বিধর্মীদের সমস্যা সবদিনই ছিল আছে থাকবে। কারণ তাহলে তারা হেরে গেল বলে মনে হতেই পারে, এই ভয়ে তারা বুঝেও না বুঝার ভান করেই থাকে থাকছে থাকবে। এই মহানুভবের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের জন্য বিরুদ্ধবাদীদের ওৎ পেতে থাকা নানান কুমন্তব্য হয়তো আমাদের অনেককে বিপর্যস্ত করে তোলে। কিন্তু গবেষনা এমনই একটি উপাত্ত যে তাকে লুকিয়ে রাখা কখনোই সম্ভব নয় ঠিক উকিলের জেরার মতো অবশ্যই সত্য চিরদিন সমাদৃত ও সমুন্নত। একে কলঙ্কিত করার পায়তারা সেই শুরু থেকেই প্রচন্ডভাবে চলছে, কিন্তু লাভের বদলে লোকসানের খাতাই ভারী হচ্ছে কারণ সত্যকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন তার একই রূপ। বিরুদ্ধবাদী রূপকাররা কখনো যায়েদ ঘটিত জয়নবের উদাহরণ তুলে ধরে আবার কখনো তুলে ধরে শিশু আয়েশার উদাহরণ। তবে এটিও সঠিক আমাদের নিজেদের অনেকের স্বচ্ছতার জন্য এটি জানাও দরকার। দুটি অভিযোগই তাদের মনগড়া ষড়যন্ত্রের অংশ। গবেষনা না করলে অনেক ভুল সমাজে শিকড় গাড়ে। একমাত্র গবেষনা সমাজের সব মিথ্যাকে সরিয়ে সত্যকে দিনে দিনে স্পষ্টই করবে। অনেক জগাখিচুড়ী চিন্তাধারায় ধর্মের অনেকেই আচ্ছন্ন কারণ এসবের উপর যতই ঘাটাঘাটি হবে ততই এসবের ভুল, গোজামিল বহুদিনের ষড়যন্ত্রে বাধা বহুজনের অনেক অপচেষ্টা খোলাসা হবে এবং কু'রআনের সত্যতা স্পষ্ট হবে।

বিভিন্ন তথ্যাদিতে এটা অবশ্যই আয়েশা(রাঃ)এর  বয়সের গোজামিলের যে সমাধান আমরা পাই ওসব জড়ো করা মিথ্যাচারী ফসল মাত্র। সংক্ষেপে তাফসির ইবনে কাছির সহ অনেক ঐতিহাসিকের মতে হযরত আয়েশার বিয়ের সময়কার বয়স ছিল ১৭ বছর এবং তারও দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯ বছর বয়সে তিনি স্বামীগৃহে যান। সংক্ষেপে বলি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এ মহিলা শিশু ছিলেন না। শিশু আয়েশার মত একজন শিশু বিয়ের যে কথা সমাজে প্রচলিত আছে সেটি কু'রআন বিরুদ্ধ কথা। কু'রআন নির্দেশ করেছে

মুসলিমদের প্রতিটি এতিম শিশুর প্রতি যত্ন নিতে তার পরিণত বয়স অবধি। কিভাবে কু'রআন বিরোধী ঐ অপকর্ম একজন আবুবকর যিনি বিবি আয়েশার বাবা ছিলেন, আর খোদ নবী ছিলেন তার স্বামী, এসব কি কখনো হওয়া সম্ভব? কু'রআন বিরুদ্ধ এসব অসংখ্য হাদিসকথা নিয়ে গোটা ময়দান গরম করে রাখে নাস্তিকেরা আজো। এই মহাপরুষের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই স্রষ্টা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এবং উপস্থাপিত হয়েছে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে। এই ব্যক্তিটির প্রধান কাজই হলো আদবের প্রতিষ্ঠা করা, আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা, সুনীতির প্রতিষ্ঠা করা, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত তার জীবনে কোন ঘটনা নেই, কোন অনাচারের সুযোগ কখনোই ঘটে নাই।

# ইসলাম ও পর্দা: তসলিমার লজ্জা

তসলিমার নির্বাচিত কলামের নির্বাচিত একটি বিতর্কিত অধ্যায় মেয়েদের পর্দাও বটে। নাসরিনের বেজায় আপত্তি মেয়েদের মাথা ঢাকা বা পর্দা পুশিদা মেনে চলাতে। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি নারীর নারীত্বকে আক্ষেপ করেন যে এক মাঠ লোকের সামনে ভাই এর মতন উদোম হতে পারেন না, যত্রতত্র 'জলবিয়োগ' করতে পারেন না বলে। দুটো কাজই অসভ্য সমাজের সভ্যতা হতে পারে কিন্তু কোনো সভ্যতার মাপকাঠিতে এসব ভাল ঠেকার কথা নয়। বড় হতেই নাসরিনের বিস্ময়! হাফপ্যান্ট পরা নিষেধ, ওড়না পরতে হবে, মেয়েদের সিগারেট ছোঁয়া বারণ, দৌড়ে দৌড়ে দোকানে যাওয়া নিষেধ, এমন শত বেড়াজাল।

"নাট্যকার এস, এম, সোলায়মান একটি নাটকে এক মৌলবাদী নারীকে কলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কলা যখন খোসা দ্বারা আবৃত থাকে, তখন সে সুন্দর, খোসা খুলে গেলে কলার মত নারীও বেপর্দা হয়" (নির্বাচিত কলাম ৭৭ পৃষ্ঠা)।

"ধর্মে মেয়েদের জন্য যত নিষেধের বানী উচ্চারিত হয়েছে, কোনো পুরুষের জন্য তার সহস্রভাগের এক ভাগও উচ্চারিত হয় নি" (নির্বাচিত কলাম ৭৬ পৃষ্ঠা)।

"যে জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, সেই নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি অদৃশ্য ও আবৃত বস্তুর প্রতি গুপ্ত ও গোপন সত্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে এ যাবৎ কোনো ধর্ম পারে নি" (নির্বাচিত কলাম ৪০ পৃষ্ঠা)।

"সৌন্দর্য শুধু নারীর শরীরে নয়, পুরুষ শরীরেও থাকে; বেশভুষা নারীর চেয়ে পুরুষের কম নয়। তবে আবৃত করবার দায় কেবল নারীর একার কেন" (নির্বাচিত কলাম)?

"আরব দেশের বর্বরতার যুগ এখন নেই। অন্ধকার কেটে গেছে। বিজ্ঞানের আলাকিত যুগে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। সভ্যতার শীর্ষে মানুষকে এখন অযথা আচ্ছাদিত হওয়া উচিত নয়। আচ্ছাদনের অর্থই শরীর নিয়ে ব্যস্ত হওয়া, সতর্ক করা, শরীরকে লোভনীয় করা"। "পরপুরুষের যদি কুপ্রবৃত্তি থাকে, তবে পর্দাপ্রথা দিয়ে সেই কৃপ্রবৃত্তি সংবরণ করা যায় না, প্রবৃত্তি উত্তরণের অন্য কোনো প্রথার প্রয়োজন। পর্দা প্রথায় পৃথিবীর কোথাও নারী হরণ, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা রোধ হয় নি। পুরুষের যৌন উন্মাদনার সকল দায় দায়িত্ব নারীকে বহন করতে হবে, নারীর শরীরে ধারণ করতে হবে ধর্মীয় বস্ত্রাদি, তা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট কোনো আধুনিক ব্যবস্থা নয়" (নির্বাচিত কলাম ৪১ পৃষ্ঠা)।

"পুরুষ ও নারীর সহাবস্থানে জীবন হয়ে ওঠে সৌহার্দ ও সম্প্রীতিপূর্ণ। তখন পুরুষের যেমন সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয় না, নারীরও নয়" (নির্বাচিত কলাম ৪১ পৃষ্ঠা)।

"নারী গর্ভধারণ করলে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। অথচ যে পুরুষের দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয় সে রেহাই পেয়ে যায়। জারজ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য অনেক নারীকে বেত্রাঘাত, জেল, জরিমানার শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু কোনো পুরুষ জারজের জন্মদাতা হবার অপরাধে শাস্তি পায় না। কারণ গর্ভধারণের মত জলজ্যান্ত প্রমাণ তাদের থাকে না" (নির্বাচিত কলাম ৫০ পৃষ্ঠা)|

"আপনি পুরুষ! পৌরুষ আপনার রক্তে টগবগ করে ফুটছে। আপনার হাতে মারাত্মক একটা অস্ত্র আছে, যা ব্যবহার করে মেয়েটির সমস্ত অহঙ্কার অথবা সারল্য যাই বলুন না কেন একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারেন। বেশী নয়, আপনাকে শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। ওই বাক্যটিই আপনার অস্ত্র, যে অস্ত্র দ্বারা আপনি আপনার গন্তব্যে অগ্রসর হবেন। তাহলো 'মেয়েটির চরিত্র ভালো নয়'। ব্যস, কেল্লা ফতে। এবার আপনি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান কি, দরজা বন্ধ করে নিরিবিলি ঘুমিয়ে পড়ুন, আপনার আর দরকারই পড়বে না ওমুখো হওয়ার কারণ বাক্যটি একাই বাকী কাজ সেরে নেবে। যাকে বলে একাই একশ'। যে কোন পার্থিব অস্ত্র বস্তুর চেয়ে সে অধিক ধারালো, অধিক তীক্ষ্ণ" (নির্বাচিত কলাম ৮১/৮২পৃষ্ঠা)।

উপরে প্রায় নয় দশটা প্যারায় উদ্ধৃতি টানলাম আমি নাসরিনের নির্বাচিত অধ্যায়ের মেয়েদের ব্যাপারে। এবার এই ব্যাপারগুলোও আমি কু'রআন থেকে পর্দার আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করার আশা রাখছি কারণ ইসলামের পর্দা কোন মনগড়া বিধান নয়, এটা দিয়ে স্রষ্টা কর্তৃক নারী জাতি ও পুরুষ জাতির উপর জীবন ধারণের সীমারেখা টানা আছে। যখনই মানুষ এ সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে তখনই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। যেমন প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবের নারীরা পর্দাপ্রথা পালন করতো না, তখনকার বর্বরযুগে মেয়েদের নানারকম বিড়ম্বনার সম্মুখিন হতে হতো, তার উপর সমস্ত সমাজ অনাচার, অশ্লীলতা, পাপাচারে লিপ্ত ছিল যার কারণে এক সময় পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয় এবং তারপর থেকে ইসলামের মেয়েরা বিশেষ করে স্রষ্টার নির্দেশ পালন করে আসছে। ছেলেদেরও পোষাকের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে পুরুষ ও নারী উভয়ের ছতর ঢাকার নির্দেশ ও মাত্রা সমান নয়। এবার কথা হলো নাসরিনের মতে আচ্ছাদনের কোনই প্রয়োজন নেই। ঢাকা জিনিসের আকর্ষণ বেশী হয়। এটা অবশ্যই স্বাভাবিক। মূল্যবানেরই মানুষ হেফাজত করে। অবহেলার জিনিস হাটে ঘাটে মাঠে পড়ে থাকে। লাজ লজ্জা পুরুষ হোক নারী হোক তার চোখের লজ্জাই আসল লজ্জা। যাদের এটি উঠে যায় তাদের চশমখোর বলে। লেখিকা অন্য কোন প্রথার প্রয়োজন বলছেন। কিন্তু প্রথাটা আর কি হতে পারে। পর্দা যদি ঢাকা হয়, তো এর বিপরীতটা উলঙ্গ বা খোলা বোঝায়। এই মানুষই তার সদাচার, ব্যবহার চাল চলনে সুশীল হয়। আবার তার কদাচার, কুআচরণ তাকে অশ্লীল অসভ্য করে তোলে। নাসরিন বারে বারে পাশ্চাত্যের উদ্ধৃতি টেনে বাহবা কুড়াতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য আপনার রঙ্গীন চোখে চমক আনলেও পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি অনেকের চোখে ভয়ের কারণ, এতে সন্দেহ নেই।

নাসরিনের প্রতিবাদ নারীর পোষাক যেন কলার খোসা, আবৃতের দায় কেন একা নারীরই, ধর্ম ও ধর্মের বিধান বা আবৃত থাকার নিয়ম নীতি মানুষকে সুপথ দেখাতে পারে না। গর্ভ ধারণের পাপ একা নারীর ঘাড়ে চাপানো এসব তিনি তুলে ধরেছেন। সত্যিকার যুক্তির ধর্ম ইসলাম নারীর ঘাড়ে কখনোই একা বোঝা চাপায় নাই তার প্রমাণ আমি একটু পরেই ঐ গ্রন্থের ভাষায়ই দেব। আর বর্তমান বিজ্ঞান এমনই দক্ষ যে, যে কোন পুরুষ লোকের এসব কুকীর্তি সঠিক ডি এন এ টেস্টএ ধরা পড়ে, পুরুষ বলে ফাঁকি দেবার সুযোগ কমেছে।

বহির্বিশ্বে অবাধ নারী স্বাধীনতার দেশে বাপেরা নিজেদের ঠিকানা হারাতে বসেছে। খৃষ্টধর্মের একটি সাজানো বানী সম্ভবতঃ তাদের সর্বনাশের জন্য দায়ী তারা মনে করে যত পাপই করুক না কেন ভগবান নামের মনুষ্য সন্তান তাদের উদ্ধার করবেন অবশ্যই। ঘুষ, সুদ তাদের যথেষ্ট কম, ধর্ম তাদের মুখে মুখে কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বলেই তাদের এই দশা। এটা মনে করার কোনোই কারণ নেই যে আমরা সব ব্যাপারেই তাদের থেকে পিছিয়ে। তাদের এক বড় অংশই বিয়ে নামক উপসর্গটিকে বাহুল্য একটি আচার মনে করে বলেই লিভি টুগেদারকে গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিতে দেখছে এবং দিব্যি পশু সমাজের মত জীবন যাপনের প্রতিই আকৃষ্ট হচ্ছে। এসব ব্যাপারে সততার মাপকাঠিতে আমরা তাদের কাছে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত, যুগের

বিস্ময়। এ ব্যাপারে তারা মোটেও আমাদের সমকক্ষ নয়, এই দুই পূর্ব ও পশ্চিমের দুই সততার ধারাকে যদি এক করা যেত তবে এর সদস্যরা এক অবিস্মরণীয় বিজয়ী জাতিতে পরিণত হতে পারতো।

যাক আমরা আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইসলামে ছেলেদেরও পোষাকের নির্দেশ দেয়া আছে। তবে পুরুষ ও নারীর ছতর বা ঢাকার বিধান এক সমান নয়, দুজনার দুটি ভিন্ন ক্ষেত্র। তার প্রধান কারণ যদি এমন হতো যে নারী পুরুষ দুজনাই সন্তান ধারণ করতে পারতো শুধু মাত্র সে ক্ষেত্রে দুজনারই এক হতো। সন্তান ধারণ করতে হলে অবশ্যই মেয়েটিকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটি পুরুষ এক সঙ্গে অনেক সন্তানের পিতা হতে পারলেও একটি মা এক সঙ্গে এক সন্তানের মা হতে পারে। এর জন্য আমাদের প্রতিপক্ষ মহিলা একজন বিজ্ঞানের ছাত্রি হয়েও কেনো যে এমন তালগোল পাকিয়ে ফেলেন এবং তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তার বিনাশে তৎপর হয়ে উঠেন। তবে এটি ঠিক তার বিদ্রোহ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়, তার মূল বিরোধ ধর্মের বিরুদ্ধে তার কথা ধর্মই যত অধর্মের মূল। সঠিকভাবে ধর্ম পালন না করলে এই ধর্মধারী গোষ্ঠীরাও অনেক অনাচার করে বেড়াবে এটা ঠিক, তাই যুক্তি হলো ধর্মকে সঠিকভাবে যুক্তির ভিত্তিতে পালন করা চাই।

অন্ধকার যুগে মেয়েরা পর্দা পালন করতো না এতে স্রষ্টা কর্তৃক পর্দার বিধান নাজিল হয়। সুরা আহজাবের লেখাকে ব্যঙ্গ করে লেখিকা বক্তব্য রাখেন। অন্ধকার যুগের মত চলাচল না করার যে নির্দেশ স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হয় তা নাসরিনের চোখে ভাল ঠেকছে না। এবার কথা হলো নাসরিনের মত হলো আচছাদনের কোনোই প্রয়োজন নেই। ঢাকা জিনিসের আকর্ষণ বেশী হয়। এটাতো স্বাভাবিক, মূল্যবানেরই মানুষ হেফাজত করে। অবহেলার জিনিস হাটে ঘাটে মাঠে পড়ে থাকে।

আপনি পাশ্চাত্যের যে কোনো সেমিনার বা অনুষ্ঠান দেখুন উপস্থিত নারীর পোশাকের স্বল্পতা আপনার বিবেককে নাড়া দেয়না হয়তো, কারণ অনেকের বিবেকে তো আবার মরিচা পড়ে আছে। একজন পুরুষ যেখানে স্যুট টাই প্যান্ট পরে সাহেব বাবুটি সেজে থাকতে পারে মেয়েটি যদি এরকম একটি স্যুট পরে থাকতো তাহলে তাকে আমি সমানাধিকারের ব্যাপারে যথার্থ মনে করতাম। কিন্তু আদৌ মেয়েটিকে প্রায় উলঙ্গ বা অর্ধউলংগ অবশ্যই দেখতে হয়। এই বুঝি স্বাধীনতার স্বরূপ? নাসরিন, আপনার তথাকথিত সহাবস্থান পুরুষকে আচ্ছাদিত করলেও নারীকে উলঙ্গ করেছে। তাই এ সভ্য বাঙ্গালীকে অসভ্য করে গড়ে তোলার আপনার এ অভিনব প্রয়াস কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব দুই-ই চরম মূল্যবান সম্পদ। পুরুষরা নারীকে নিয়ে মজা লুটতে ওস্তাদ কিন্তু এমন নারীকে কেউ বউ হিসাবে চায় না। একটা ভদ্র সুশীলা লক্ষ্মী মেয়েই সব সুশীল পুরুষেরই কাম্য। একটা ভাল নারীও কোনদিন একটা নষ্ট পুরুষের স্বপ্ন দেখে না। সৎ, আদর্শ চরিত্রবান ছেলেই একজন চরিত্রবতী মেয়ের কাম্য। আজকের যুগ গণতন্ত্রের যুগ, সবার কথা শুনতে হবে। পুরুষ যেমন নারীকে লাঞ্ছিত করে, অনেক নারীও পুরুষের সাথে ছলনার খেলা খেলে। নারী বলেই যে তিনি সতী সাবিত্রী তা তো নয়, উশৃঙ্খল বেলাল্লা মেয়েদের খপ্পরে পড়ে অনেক ছেলেও আজকাল লাঞ্ছিত হচ্ছে। এককালে বোকা পুরুষ জাতিই নারীকে যেমন লাঞ্ছিত করেছে ঠিক তেমনি পুজোও দিয়েছে। জগতে নারীরাই পূজিত হয়েছে বেশী; লক্ষ্মী বলেন, স্বরস্বতী বলেন, দূর্গা বলেন, কালী বলেন সবাই নারী আর এই সেই ধর্ম যেখানে নারীর কোন মর্যাদা নেই, কিন্তু সেই নারী আবার দেবী!!

A man is always well known by his dress. একজন মানুষের পরিচয় সব সময়ই তার পোষাকেই ফুটে উঠে। নর নারী, চাষা-ভুষা, কুলি, মজুর, সাহেব, পুলিশ, নার্স, দারোয়ান, গার্ড এমন তরো হাজারো পেশায় মানুষ পোশাকেই তার পরিচয় সর্বাগ্রে তুলে ধরে। তাকে আর বলতে হয় না সে কি? মুসলিম মেয়েরা এক্ষেত্রে ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী। সে যে মুসলিম এটাই তার বড় পরিচয়। এটা

বিবাহিতা-অবিবাহিতার চিহ্ন নয়, এটা একেশ্বরবাদীতার চিহ্নমাত্র। ইসলামে মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশত স্বীকৃত হলেও কোথাও বাবার পায়ের তলায় বেহেশতের কথা বলা নেই। তাই সব কিছুতেই সমতা খুঁজবেন না। আমরা নারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে কম তো পাই-ই নি, বেশী পেয়েছি। ইসলাম কখনো পুরুষের দায় নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় নি। সুবিধাবাদী সমাজপতিরা চাপাতে পারে,অতীতেও চাপিয়েছে, ভবিষ্যতেও হয়তো চাপাবে কিন্তু একমাত্র ইসলামের সফল প্রয়োগই নারীকে মুক্তি দিতে পারে, আর কেউ নয়।

আপনাদের কুপরামর্শ নারীকে বাজারের পণ্যই করবে। পর্দা প্রথা পৃথিবীর কোথাও কল্যাণ এনেছে আপনি দেখেন নি, আপনি শুধু দেখেছেন পর্দাহীনতা নারীকে নারীধর্ষণ, নারীহত্যা থেকে রক্ষা করেছে। পাশ্চাত্যের সঠিক খোঁজটি নিন, তাহলে আপনার বিকৃতি কাটবে। চোখ কান খোলা রেখে একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখবেন - মিথ্যার সাথে আর কতকাল বসবাস করবেন, সত্যের সাথে আঁতাত করুন, সত্য ও সুন্দরের জলসায় যোগ দিন।

নাসরিন, সেই অস্ত্রখানি যেটি আপনি পুরুষের হাতে তুলে দিয়েছেন, "মেয়েটির চরিত্র ভল নয়।" এই কথাটির মারপ্যাঁচে একজন পুরুষ একটি মেয়ের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। হ্যাঁ, তারও জবাব আমি কু'রআনের ভাষায়ই দেব পরবর্তী চ্যাপ্টারে। সাধারণতঃ বখাটে ছেলেরা বখাটে মেয়েদের দেখলে একটু বেশী উৎপাত করে। তবে হ্যাঁ, বখাটে ছেলে যে ভাল মেয়েদের উত্যক্ত করে না--- তাতো নয়। তাই বলে বখাটে ছেলে দেখে আমি আমার মেয়েকে বখাটে হবার পরামর্শ তো দিতে পারি না। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বখাটে ছেলে আবার ভাল সুশীল মেয়েদের যথেষ্ট সমীহ করেও চলে। একজন পুরুষ বা মেয়ে তার ব্যক্তিত্বেই সে শক্তিশালী হয়ে উঠে। বখাটেরা ব্যক্তিত্বকে ভয় পায়। তাই বলি, যদি মা-বোনদের সু-পরামর্শ দিতে চান তবে আমি বলবো, তোমরা চলনে বলনে ব্যক্তিত্বশীলা হয়ে উঠো। প্রয়োজনে বখাটেদের শায়েস্তা করতে নিজেরাই তৎপর হও তবে বখাটে সেজে নয়, মর্যাদাশীল সেজে।

মুসলিম মেয়েদের উপর পর্দার আয়াত এই প্রেক্ষিতেই নাজিল হয় যাতে তাদেরে সম্ভ্রান্ত মেয়ে বলে মনে হয়। তারা যেন তাদের পর্দা তাদের উপর টেনে দেয় এতে অন্ততঃ বোঝা যাবে এ মেয়ে রাস্তার নষ্টা মেয়ে নয়, এ ব্যতিক্রমী অবশ্যই। আর অশ্লীল নষ্ট ছেলে ও মেয়ের ব্যাপারে স্রষ্টার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। তার প্রয়োজনও আছে। সমাজের স্বচ্ছ, সুস্থ ও সুষ্ঠু অবস্থা বহাল রাখার জন্য প্রয়োজনে শাস্তির প্রয়োজন অবশ্যই আছে। নয়তো এ পৃথিবী মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। কবির সে বানী ব্যর্থ শোনাবে আমাদের কাছে।

"কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর,
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক
মানুষেতেই সুরাসুর।

আর সর্বোপরি কোন রটনাকারী যদি মেয়েদের চরিত্র নষ্ট করার অস্ত্র চালায় অর্থাৎ মিথ্যা রটনা বা কুৎসা করে, তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ স্পষ্ট ব্যবস্থা দিয়েছেন কু'রআনে তা আমি পরবর্তীতে আলোচনা করছি।

## পর্দার আয়াত:

সুরা আহযাবের ৫৯ ও সুরা নূর এর ৩১ আয়াতে মুসলিম মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ ও স্বাভাবিক অবস্থায় কাদের সামনে স্বাভাবিকভাবে বের হওয়া যাবে তারও নির্দেশনা দেয়া আছে। তাছাড়া

একজন মেয়ে পর্দার সীমারেখা পালন করে দুনিয়ার সমূহ দায় দায়িত্ব কাজকর্ম করার সমান অধিকার রাখে। একজন মেয়ে হতে পারে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দেশনেত্রী, সমাজনেত্রী, সেবিকা এক কথায় হালাল রোজগারের কারণে, মানবতার কল্যাণে ইহজাগতিক সব ধরণের কর্তব্যকর্ম সমাধা করার সমান অধিকার আল্লাহ নারীকে দিয়েছেন। আর চলনে বলনে শালীনতার নির্দেশ স্বরুপ পুরুষের উপরও আল্লাহ তার সীমারেখা এটে দিয়েছেন। ইসলামে আবৃত করার দায় শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও আছে। দেখুন সুরা নূরের ৩০আয়াত।

"হে প্রিয় নবী (ফর্সা কাপড়ে অধিক ময়লা হয়, তাই) তোমার স্ত্রীগণকে ও কন্যাদের ও মুমিন লোকের স্ত্রীলোকদের বলো যে (তারা দরকার মতো বাইরে যাবার কালে ৩৩:৩৩) তারা যেন তাদের বহির্বাস থেকে (প্রয়োজনীয় কাপড়) তাদের উপরে টেনে রাখে (যাতে তাদের হাত, বুকও গলা ঢেকে রাখা হয় এবং সেখানের অলঙ্কারও ঢেকে রাখা হয় ২৪:৩১) এইটি (তাদের জন্য) বেশী ভাল হয় যেন তাদের (সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে) চেনা যায়, তাহলে (মন্দ চরিত্রের লোকের দ্বারা) তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ (পদস্থলন থেকে) পরিত্রাণকারী অসীম কৃপানিধান (ফলে অন্যায়কে তিনি শুধু নিষেধই করেন নি বরং তা থেকে নিস্তার পাবার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন)। **(সুরা আহযাবের ৫৯ আয়াত)**

"আর মুমিন নারীদের বলো যে তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে, আর তাদের আঙ্গিক কর্তব্যাবলি হেফাজত করে, আর তাদের অঙ্গশোভা (তথা অলংকার) যেন প্রদর্শন না করে শুধু তার মধ্যে যা (সাধারণতঃ আপনা আপনি) প্রকাশ হয়ে থাকে, তা ভিন্ন (যথা হাত ও মুখমন্ডল, আবু ৩১:৩০); আর যেন তারা তাদের মাথার কাপড় (বা ওড়না দিয়ে তাদের বুকের উপরটা ঢেকে রাখে; আর তারা যেন তাদের শোভা সৌন্দর্য (কারোর সমক্ষে) প্রদর্শণ করে না শুধু তাদের স্বামীদের অথবা তাদের ভাইদের অথবা তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রদের অথবা তাদের ভাগনেদের অথবা তাদের পরিচারিকাদের অথবা তাদের ডানহাত যাদের (বন্দীত্বে) ধরে রেখেছে (২৩:৬) অথবা পুরুষ চাকর নকর যাদের কাম লালসা নেই (বুখারী ৬৫:২৪) অথবা ছেলেপিলেদের যাদের নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানবোধ হয়নি। এমন লোকদের ভিন্ন; আর তাদের পা দিয়ে যেন তারা (নাচের তালে বা দুপদাপ করে মাটিতে) আঘাত না করে যাতে তাদের অলংকারের যা লুকিয়ে আছে তা (বাইরের লোককে ) জানানো যায়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর দিকে ফেরো যেন (দুজাহানেই) তোমাদের সফলতা অর্জন হয়" **(সুরা নূরের ৩১ আয়াত)**।

"(হে মুহাম্মদ) তুমি মুমিন পুরুষদের বলো যে তারা (নারীদের থেকে) তাদের দৃষ্টি অবনত করুক এবং তাদের আঙ্গিক কর্তব্যাবলী হেফাজত করুক (অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করুক, ২৩:৫ কেননা, ইসলামে ধর্মকর্মের দিক দিয়ে নারী পুরুষের মর্যাদা সমান সমান, ১৬:৯৭; ৩৩:৩৫, তাই সমাজে চলনে ফিরনে পথে ঘাটে নারী পুরুষে দেখাদেখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে)। এ তাদের জন্য পবিত্রতর (কেননা এতে সমাজকে নৈতিক ব্যাধি থেকে মুক্ত রেখে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ করার ঔষধ রয়েছে) তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্ণ ওয়াকিফহাল" **(সুরা নূরের ৩০ আয়াত)**।

আর একজন নষ্টা মেয়ে ও নষ্ট ছেলের জন্যও শাস্তি স্বরূপ আছে ইসলামিক বিধান। তাও প্রকাশ পেয়েছে সুরা নূরের ২ নম্বর আয়াতে (নীচে দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও যদি কোনো ব্যক্তি সতি সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং সে উপস্থিত কমপক্ষে চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে তবে তার উপর আশি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেয়া আছে এবং ভবিষ্যতে তার কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার অর্থ সে একজন চিহ্নিত মোনাফেক রূপে সমাজে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এটাই ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর নির্দেশ। এটা ইহজাগতিক শাস্তি, তার উপর স্রষ্টার লাঞ্ছনা এ ধরণের লোকের

উপর থাকবে ইহকালে এবং পরকালেও (সূত্র সুরা নূরের ২৩ আয়াত)। তবে কেউ যদি বা ঠিক ঠিকই অনুতপ্ত হয়, সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতেও পারে (সূরা নূরের ৫আয়াত)।

"ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী তাদের দুজনার প্রত্যেককে (গুনে গুনে) এক'শ বেত্রাঘাতের চাবুক মার (অবশ্য পিটে পিঠের ছাল তোলার চেয়ে লোকের সামনে অবমাননা করার প্রতি অধিক জোর দেবে, তবে ইহুদীদের বিধান অনুযায়ী পাথর মেরে, মেরে ফেলার কথা ভাববে না ৪:১৫) আর আল্লাহর বিধান পালনে তাদের প্রতি অনুকম্পা যেন তোমাদের পাকড়াও না করে যদি তোমরা (ঠিকঠিকই) আল্লাহতে ও আখেরাতের দিনে (কর্মফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে) বিশ্বাস কর (তবে যদি কোনো সতীসাধ্বী ধর্ষিতা হয় তবে শাস্তি পাবে ধর্ষণকারী, নিরপরাধীর উপরে শাস্তি বর্তাবে না); আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি দেখতে পায় (যাতে দর্শকরা এ ধরণের সমাজ বিরোধী পাপাচারকে ভয় করে চলে, সুরা নিসার ২৫ আয়াত)" **(সুরা নূরের ২ আয়াত)**।

"আর যারা সতী সাধ্বী নারীকে (ব্যাভিচারের) অপবাদ দেয় এবং (পরিবার ও সমাজের নৈতিকতার এমন গুরুতর অভিযোগে) চারজন সাক্ষী পেশ করে না (যদিও অন্যান্য লেনদেন বা অপরাধের সাক্ষী সাবুদ প্রদানে দুইজনের সাক্ষীই যথেষ্ট ২:২৮২), তাদের (সেই কলঙ্ক রটনাকারীদের) আশি বেত্রাঘাতে চাবুক মার, আর তাদের থেকে (ভবিষ্যতে) কখনও সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কেননা তারা নিজেরাই তো সীমালংঘনকারী" **(সুরা নূরের ৪আয়াত)**।

"তাদের ক্ষেত্রে ব্যতীত যারা এর পরে তওবা করে শুধরে নেয় (৪:১৭-১৮, ধোলাই পিটাইএর ও সমাজচ্যুতির অবমাননার ফলে তেমন অনুতপ্ত ও সংশোধিত লোকদের পুনরায় সমাজে স্থান দেয়া যাবে), কেননা আল্লাহ নিঃসন্দেহ (দোষত্রুটি থেকে) পরিত্রাণকারী অসীম কৃপানিধান" **(সুরা নূরের ৫ আয়াত)**।

"নিঃসন্দেহ যারা সতী সাধ্বী নিরীহ, বিশ্বাসিনী নারীকে অপবাদ দেয় (এবং মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে ২৪: ৪) তাদের ইহলোকে ও পরলোকে অভিশাপ দেওয়া হবে, আর তাদের জন্য রইবে কঠোর শাস্তি" **(সুরা নূরের ২৩ আয়াত)**।

উপরোক্ত সাতটি আয়াতের ভিত্তিতে কু'রআন ভিত্তিক স্রষ্টার নির্দেশের প্রেক্ষিতে পর্দার ব্যাপারে নাসরিনের উত্থাপিত নানান বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার জবাবে আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম।

নির্বাচিত কলামের ৬২ পৃষ্ঠাতে নাসরিন বলেন, "বিজ্ঞান আমাদের প্রগতিশীল কতটা করে জানি না। তবে অবৈজ্ঞানিক কম করে না এদেশের শিক্ষা আমাদের সংস্কারমুক্ত কতটা করে জানি না, তবে অশিক্ষিতও কম করে না।"

বিজ্ঞান ধরতে পারলে কেউ অবৈজ্ঞানিক হয় না। বিজ্ঞান ধরতে পারার অক্ষমতাই বিজ্ঞানহীনতার জন্য দায়ী। সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে সত্যিই যারা বিজ্ঞানপন্থী তারা কখনো অবৈজ্ঞানিক হয় না। আর শিক্ষারও দুটো রূপ; সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা। তাই শিক্ষা নিলেই সবাইকে শিক্ষিত হয়তো বলা যায় তবে সব শিক্ষাই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না; সুশিক্ষা যদি থাকে তবেই কল্যাণ আসে। আর কুশিক্ষা সমাজের কদর্যতা, ব্যর্থতা আরো বাড়িয়ে তোলে।

বিজ্ঞান অর্থ কোন বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞানে সমৃদ্ধ জ্ঞান। আর ইসলাম অর্থ শান্তি। শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম আর বিজ্ঞানে কোনই বিতন্ডা নেই। দুটোই বিজ্ঞান, একে অন্যের পরিপূরক। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও কু'রআনীয় শিক্ষা মুসলিমদেরে কি পরিমাণ বিজ্ঞানময় করে গেড়ে তুলেছিল তা যারা সঠিক ইতিহাস

পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন কু'রআনের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান তাদেরে কেমন করে উন্নতির শিখরে টেনে তুলেছিল। আর আজ আমাদের ঘরে যদিও কু'রআন আছে ঠিকই, তবে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও চর্চা কম থাকার কারণে আমরা পিছেয়ে পড়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি। এ গ্রন্থকে শুধু তোতাপাখির মতো ঠোঁটে ধারণ করলে হবে না, আত্মার মাঝে, বাস্তব জীবনে পালন করতে হবে। মানুষকে অবশ্যই কর্মী অর্থে সৎকর্মী হতে হবে। আর জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি কাজে এই গ্রন্থেরই প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

আল্লাহ অর্থে স্রষ্টা বিজ্ঞানময়, তার সৃষ্টিও বিজ্ঞানময়। মুসলমানদের অতীত গৌরবের ইতিহাস যে কত বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ছিল তার একটু আভাস দেয়ার জন্য আমি নীচে একটি কলাম যোগ করছি।

মুসলিমগণ তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও মানমন্দির নির্মাণ করে জগতের বহু শতাব্দী সঞ্চিত লুপ্তপ্রায় জ্ঞান বিজ্ঞানের উদ্ধার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। তারা বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, খগোল-বিজ্ঞান ভৈষজ্য শাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানে বহু নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ও অনেক উন্নতি বিধান করে জগতে প্রচার করেন। আধুনিক গণনা পদ্ধতি, ঘনসমীকরণ বিশ্লেষণ ও লগারিদম তাদেরই অনুশীলনের ফল। তারা তারকারাজির মানচিত্র এঁকে বড় বড় তারকাগুলির যে নাম দিয়েছিলেন, আজও অনেক তারকা ঐ নামেই অভিহিত হচ্ছে। তারাই প্রথমে বিষুব রেখা, অয়ন মন্ডলের সংযোজন স্থান এবং গুপ্ত তারকারাজির অবস্থিতি নিরুপন করেন। তারাই সর্বপ্রথম রাসায়নবিদ্যা খগোল-দোলক আবিষ্কার, পদার্থ সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ, আলোক বিজ্ঞানের রশ্মিতত্ত্ব উদ্ভাবন, রাসায়নিক ক্রিয়া বলে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এবং কাগজ, দিকদর্শন যন্ত্র ও বারুদ আবিষ্কার তাদেরই গভীর গবেষণার ফল। পন্ডিতবর স্কট সত্য সত্যই বলেছেন, "Modern science unquestionably owes everything to Arab genius". অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান প্রশ্নাতীতভাবে আরব মেধার কাছে ঋণী হয়ে আছে।" তাই আপনারা যারা নিজেদের পরিচিতি হারিয়ে ফেলেছেন তাদের সুনির্দিষ্ট রাস্তার সন্ধানে সত্যের রাস্তায় চলতে আহবান জানাই। এই রাস্তা তারাই তাড়াতাড়ি হারান যারা ধর্মও বুঝেন না এবং বিজ্ঞানও না। অনেক বিজ্ঞানহীন ধর্মধারীরা আছেন তারাও এভাবে সত্য রাস্তা চিনতে বারে বারেই ব্যর্থ হন। তাই সহজ বাস্তবতা হলো ধর্মহীন এবং বিজ্ঞানহীন দুই দলের সদস্যই এক খোরে মাথা মোড়ানোর দল। এদের মধ্যে তথ্যগত খুব একটা পার্থক্য নেই । দুজনাই সত্যের শত্রু।

# তসলিমা নাসরিনের উত্থানের নেপথ্যে কিছু তথ্য

এখানে উল্লেখিত এই চ্যাপ্টারটি আমার আগের সংস্করণে ছিল না। আমি বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন ভাবে এটি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। এ শতাব্দীর প্রায় শুরুর সময়ে অনলাইনে সদালাপ নামের এক অনলাইন সাইটে আমার এ লেখাটি তারা ধারাবাহিক প্রচার করেছিল। তখন সেখানে সামান্য 'র' প্রসঙ্গ আসাতে এর উপর ব্যাখ্যা চেয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে ওটি দেয়া হয়নি। তাই এর উপর কিছু তথ্য প্রমাণ এ চ্যাপ্টারে দেয়া হলো। কারণ হঠাৎ করে তসলিমার উত্থান দেখা যায় একক কোন ঘটনা নয় বাংলাদেশের মানচিত্রে এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে বেশ দিন থেকে। তার প্রামাণ্যতা জনতার সামনেও উন্মোচিত হয়েছে কারণ কোন সত্যই বেশী দিন ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। এ প্রসঙ্গে সদ্য সমাপ্ত ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী সম্মেলন উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার একটি উদ্ধৃতির কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের সুবিখ্যাত সম্পাদক সি পি স্কট- এর একটি উক্তি স্মরণ করেন। স্কট বলেছিলেন, "আপনি যে কোন মতামত প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু সত্যটা পবিত্র। সত্যকে ওলট পালট করে প্রকাশ করাটা অনুচিত। তাই আমি আজ আপনাদের সবার প্রতি অনুরোধ করছি, বাংলাদেশ সম্পর্কে সত্যটা শুদ্ধভাবে লিখুন।"

তসলিমা কোন সাংবাদিক ছিলেন না, তবে সাহিত্যিক হিসাবে তিনি যে কাজটি করে যান তার সূত্র আজ অনেকের কাছেই পরিষ্কার, আর এরকম মনের আরো অনেকেই আছেন যারা একই সুরের নিক্কন তুলে তা প্রমাণ করে গেছেন, তাদের নামধাম আলাদাভাবে না বললেও চলবে কারণ ইতিহাসই তাদের ধরে রেখেছে যা তারা নিজেরাই স্পষ্ট করে গেছেন। তাদের কাজই প্রধান প্রমান। সেখানে কাউকে মিথ্যা অভিযুক্ত করা আরো একটি বড় ধরণের অপকর্ম। সত্য ধর্মের বানীবাহক এ নবীকে তার স্বজাতীর ধর্মবেত্তারা নানা নামে ডেকেছে, টিটকারী দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদে সম্মোধন করেছে। আবার 'আল-আমিন' নামের 'বিশ্বাসী' তকমাটিও তাদেরই দেয়া। কখনো পাগল কখনো কাফের কখনো কবি কখনো গণক এসব যখন যা মুখে আসে তাই ছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে চৌদ্দশত বছরেও তসলিমাসহ কেউই ওসব প্রমাণ করতে পারেনি। কারণ সবই ছলবাজদের মিথ্যা অভিযোগ, যার সাথে সত্যের কোন মিল নেই। আজ চৌদ্দশত বছর পরও নাসরিন একজন মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েও ঐ সত্য সাধককে বা তার মাধ্যমে নাজেল হওয়া ধর্মকে মেনে নিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত ধর্মের সাথে দেশও তার শত্রু হলো, পর হলো। পাঠক লক্ষ্য করুন কিভাবে ইতিহাস ও ময়দানের দাগচিহ্ন সব স্পষ্ট করছে।

- ইন্দিরা গান্ধী চান নি যে, ভারতের পূর্ব পার্শ্বে পাকিস্তানের মত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটুক। এ ধরণের আশঙ্কার কথা ফিল্ড মার্শেল মানেকশ ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭১ সালে উল্লেখ করেছিলেন।
- তাই ইন্দীরা তার ব্রেইন চাইল্ড 'র'কে যেন তেন প্রকারে একটি দূর্বল বাংলাদেশ ও সেখানে একটি তাবেদার শাসক শ্রেণী প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে গোপন সাতদফা চুক্তির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে বাংলাদেশকে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহারের জন্য 'পঁচিশ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি'তে আবদ্ধ হতে বাধ্য করান ("গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা

বাংলাদেশে "র" আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরুপ সন্ধান" লেখক আবু রুশ্‌দ, ৩০ পৃষ্ঠা; প্রথম প্রকাশ–১লা মে ১৯৯০ সাল ।

- ভারতীয় ষ্ট্র্যাটেজিক বিশেষজ্ঞদের মতে "বাংলাদেশের অবির্ভাব ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ৭টি রাজ্য (সেভেন ষ্টার) তখন হতে আজ পর্যন্ত কাশ্মীরের পর পরই সবচেয়ে বেশী গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকারের আধিপত্য একটি ঐতিহাসিক সত্য। বাংলাদেশ হতে পাকিস্তানীদের জোরপূর্বক বহিষ্কার ভারতীয় সরকারের মনে যথেষ্ট ভীতি সঞ্চার করে। (ব্রিগেডিয়ার আনোয়ারুল আজিম খান, (Indo-Bangladesh Friendship treaty: Exression of Indian Mistrust and our Sincerity, Dhaka courier, 15 April 1994)
- আমাদের দেশের বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবিগণ পশ্চিমবঙ্গীয় কোন বই, পত্র পত্রিকা আমদানী নিষিদ্ধ করলে "জ্ঞানের অঙ্গনে প্রতিবন্ধকতা কাম্য নয়" বলে তৎক্ষণাৎ বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এটাও সবাই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের ভাষা বাঙ্গলা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বড় বড় সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিদের কোন বই, এমনকি কোন সাহিত্য পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য হারে ওখানে যায় না। বা ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার নেয়ার অনুমতি দেয় না। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ওখানকার কেউ উদ্যোগ নিলেও সে উদ্যোগ প্রতিহত করা হয়। (৩১ পৃষ্ঠা বাংলাদেশে 'র')
- 'র' এর সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞরা "রাষ্ট্রীক পরাধীনতা দৃষ্টিগ্রাহ্য কিন্তু কৃষ্টিক পরাধীনতা ধরাছোঁয়ার ও দৃষ্টির উর্ধ্বে"। (মাহবুব আনাম, "বেশী দামে কেনা অল্প দামে বেচা"---আবুল মনসুর আহমদ রচিত বইয়ের মুখবন্ধে উদ্ধৃত) ধারণাটিকে নিজ দেশে প্রতিহত করে বাংলাদেশে রফতানী করেছে (৩১ পৃষ্ঠা, বাংলাদেশে "র")
- ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি সম্বন্ধে জানা যায় আলাপ আলোচনার পর আলোচ্য কমিটির নাম রাখার সিদ্ধান্ত হয় "ঘাতক দালাল প্রতিরোধ কমিটি"। এটি ৯১ সালের ডিসেম্বর এর কথা। এর মাঝে লে. কর্ণেল নূরুজ্জামানের এককালীন ঘনিষ্ট এক বিশিষ্ট সাংবাদিক হুট করে এই কমিটির নাম থেকে "প্রতিরোধ" শব্দটি বাদ দিয়ে "নির্মূল" শব্দ ব্যবহারের কথা বলেন। এরপর কোথা দিয়ে কি হলো, স্রোতের মতো এগিয়ে এলেন জাহানারা ইমামসহ অসংখ্য ভারতপন্থী ব্যক্তিত্ব। (ঘাতক দালাল প্রতিরোধ কমিটি গঠনের সাথে জড়িত নাট্যকার সাংবাদিক আহমদ মুসার সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার) নির্দলীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আইডিয়া পরিবর্তিত আকারে হাইজ্যাক হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই। (১৬২ পৃষ্ঠা, বাংলাদেশে "র")
- ১৯৯৩ সালের শুরু থেকেই ভারত যাবতীয় উপায়ে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক দেশ হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করায় তৎপর হয়ে উঠে। ১৯৯৩ সালের ১লা অক্টোবর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। 'র' এর পূর্বাভাস পেয়েই সে সময়কার বিএনপি সরকারকে ঐ ভাষণের পূর্বেই বিশ্ব দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বেশক'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর একটি ছিল কংগ্রেসের রিপোর্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা ও এর সমান্তরালে বাংলাদেশী অনুগামীদের সাহায্যে "হিন্দু নির্যাতন" সংক্রান্ত প্রচারণা জোরদার করা।
- ১৯৯৮ সালের ২০ মে জন্ম নেয়া হিন্দু–বৌদ্ধ–খৃষ্টান ঐক্য সংগঠনটি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আসছে একের পর এক। এরা সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার আড়ালে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিনাশের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর সে ঘটনার কোন প্রতিবাদ না করে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য সংগঠন উল্টো বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর তথিত অত্যাচারের অজস্র ভুয়া তথ্য তুলে ধরে এবং ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী স্বাক্ষরিত এই পত্র প্রেরিত হয় বিভন্ন এনজিও এবং বিদেশী দূতাবাসগুলোতে। এরপর কি

একথা বলা অন্যায় হবে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ বঙ্গভূমিওয়ালাদের কার্বন কপি, তাদের সহায়ক শক্তি কিংবা ঐ দেশীয় এজেন্ট (শেখ নুরুল ইসলাম, তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনঃ বর্তমান তৎপরতা ও তার নেপথ্য কাহিনী, দৈনিক দিনকাল, ৪ ডিসেম্বর ৯৩ সংখ্যা)?

- শান্তিবাহিনী ইস্যু, ফারাক্কা ইস্যু, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন, কাল্পনিক সংখ্যালঘু নির্যাতন, পুশইন-পুশব্যাক সমস্যা, দুই বাংলার একত্রিকরণ, দুর্গাপূজার বদলে ঘটপূজার আয়োজন, জন্মাষ্টমীর মিছিলে হামলা এমন তরো শত সমস্যার ভাগাড়ে ক্ষুদ্র দেশটিকে জড়িয়ে ফেলার নানান অপপ্রয়াসের প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আজকের সচেতন জনতার লেখালেখিতে। এখানের সবকটি সমস্যার সাথে অতোপ্রোতভাবে জড়িত এই সমস্যাটির নাম তসলিমা সমস্যা, তার কথাও কাজ উপরে বর্ণিত সব সমস্যার সাথে একীভূত।
- ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বিএনপি সরকারের শাসনামলে প্রায়শই ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে কথক নাচের অয়োজন করা হতো। সেখানে বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত "র" কর্মকর্তা মিঃ মহাপাত্র এবং তার সুশিক্ষিত ড্যান্সার স্ত্রী থাকতেন আসরের মধ্যমনি। উক্ত অনুষ্ঠানে সরকারী, বিরোধী দলীয় সবাই সরল বিশ্বাসে দাওয়াত কবুল করতেন। এভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনের সবদিকে চ্যানেল মেইনটেইন করার পাশাপাশি মিঃ মহাপাত্র এদেশে সংঘটিত অনেক অঘটনের পিছনেও অদৃশ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে একটি কথিত নির্মূল কমিটি গঠন, তসলিমা নাসরিন ইস্যু সৃষ্টি, শান্তি বাহিনী সমস্যাকে যে কোন অজুহাতে সমাধানে বিলম্ব করা ও বাংলাদেশ ভূখন্ড থেকে আই এস আই উত্তর পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উস্কানী দিচ্ছে এ প্রচারণা চালানোয় মিঃ মহাপাত্র অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেন (২২৩ পৃষ্ঠা, বাংলাদেশে "র")।
- একটি ঘটনা ঘটিয়েই 'র' চুপচাপ বসে থাকে না। বরং এধরণের প্রচারণা তারা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যায় পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশে কোন সশস্ত্র বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজন নেই---এমন প্রচারণা ভারত থেকে যেমন অব্যাহতভাবে চালানো হয়, তেমনি বাংলাদেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্ট, সংবাদপত্র ও প্রচারণা চালায় একই সুরে।
- ২০শে মে ৯৬ এর ক্যু দে তার পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে ভারতীয় সেনা সমাবেশ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে সেনাবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস বরখাস্ত করেন। একই সময়ে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশের বিপুল সেনা সদস্য, আধা সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, প্রেসিডেন্ট যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে এবং সেনাবাহিনীর দেশ প্রেমিক সদস্যরা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে না পারলে পরিস্থিতি একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পিত ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারতো। যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকেই হুমকির সম্মুখিন করে দিতে পারতো।
- সাউথ চায়না পোষ্ট পত্রিকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, "বাংলাদেশের রাজধানীর রাস্তায় ট্যাংক 'ম্যুভ' করছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি"।
- অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে জাপানী পুজি বিনিয়োগ ও হরতাল ধর্মঘট যোগসূত্র, নাশকতামূলক কর্মকান্ড, শ্রমিক অসন্তোষ, এবং সম্ভবতঃ কখনোই বাংলাদেশ এই রাহু থেকে মুক্তি পাবে না। ১৯৯৪ সালে যখন যমুনা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু হয় তখন যাতে মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা কাজে লাগানো যায় সেজন্য তদানীন্তন সরকার ১৯৯২ সালে উত্তর কোরিয়ার সাথে একটি স্মারকে স্বাক্ষর করে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য চক্রের কারসাজিতে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের কাজ পরপর পিছিয়ে যায়। ফলে যমুনা ব্রিজের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকশ' কোটি টাকার পাথর আমদানী করতে হয় ভারত থেকে। এবং এই প্রকল্পে উত্তোলিত অবিক্রিত বেশীরভাগ পাথরই

অবিক্রিত পড়ে আছে ভারতীয় পাথর সহজ শর্তে আমদানীর অজুহাতে। পদে পদে সুকঠিন ষড়যন্ত্রে একটি দেশের অবকাঠামো বিনাশের পায়তারা এভাবেই হচ্ছে বেশ বড় সময় থেকে।

- ৬ জুলাই ৯৪ সংখ্যা "নিউইয়র্ক টাইমস" এ তসলিমা নাসরিনের উপর লেখা "সেন্সরশীপ বাই ডেথ" শিরোনামের এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশকে ধিক্কার জানানো হয় তসলিমার "লজ্জা" বইয়ের নামে 'শেম' শব্দ দিয়ে।
- এর ঠিক পরদিন ১৪ জুলাই ৯৪ তারিখে আবার তসলিমাকে লেখা সালমান রুশদীর খোলা চিঠি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে "নিউইয়র্ক টাইমস"। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ভারতীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই 'র' সফলভাবে তসলিমা ইস্যুকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত বৈরী প্রচারণা সম্পর্কে একইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক ঠিকানার মন্তব্য প্রতিবেদন থেকে।
- বাংলাদেশ বিরোধী এই সংঘবদ্ধ দল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এখন তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের এই তৎপরতারই ফসল হচ্ছে ৬ জুলাই "নিউইয়র্ক টাইমস"এর "সেন্সরশীপ বাই ডেথ" সম্পাদকীয়টি।
- বাংলাদেশ বিরোধী এই সংঘবদ্ধ দল কখনো সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব, কখনো বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে অবৈধভাবে শিশু শ্রম নিয়োগ, কখনো বা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে কথিত গণহত্যা অথবা মন্দির গীর্জা ধ্বংসের অভিযোগ এনে জোর অপপ্রচার চালিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তথ্য, ছবি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রভৃতি সংগ্রহ করে সেগুলির প্রয়োজনীয় ইংরেজী অনুবাদ করে এরা যথাযোগ্য স্থানে সরবরাহ করে থাকে (মনজুর আহমদ, যুক্তরাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ দলের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার, দৈনিক বাংলা, ১৯ জুলাই ৯৪ সংখ্যা)।
- তসলিমা নাসরিনের "লজ্জা"কে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশের প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে বিজেপি ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত হয়। আড়ালে এর ইন্ধনদাতা হিসাবে থাকে 'র'। সে সময় যে কোন উপায়ে বাংলাদেশকে অব্যাহত চাপের মুখে রাখাই ছিল এসব প্রচারণার লক্ষ্য।

- অবশ্য এটা ঠিক প্রথম প্রথম এ পক্ষের প্রচারণা এদেশের সাধারণ জনতার একাংশ ভারতীয় অভিযোগ সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। অথচ, এসবই যে জনমতকে বিভ্রান্ত বা প্রভাবিত করণে 'র' গৃহীত অপকৌশল তা কিন্তু স্বয়ং ভারতীয় বিশ্লেষকগণই স্বীকার করেছেন। (বাংলাদেশে "র" লেখক আবু রুশ্‌দ, পৃষ্ঠা ১৮২-১৯৮)।

৩০শে মার্চ "র" এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইনষ্টিটিউট ফর ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস এর ডাইরেক্টর কে, সুব্রামানিয়াম ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে বললেন, "যে বিষয়টি ভারতের উপলব্ধিতে আনতে হবে, সেটা হলো পাকিস্তানের ভাঙ্গন আমাদের স্বার্থেই আসবে। এ জাতীয় সুযোগ কখনো আর আসবে না। (লেখক অনুদিত সিদ্দিক সালিকের "নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল", পৃষ্ঠা ১০৮)।

কে সুব্রানিয়াম যৌথভাবে মোহাম্মদ আইউব এবং তার লেখা "দ্য লিবারেশন ওয়ার" গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন- "ভারতের জন্য এটা এমন একটা ঘটনা যা শতাব্দীতে আর ঘটে নি।"

"বর্তমান আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু চার বছর আগে তসলিমার লেখা সমূহকে বাংলাদেশ বিরোধী ও তসলিমাকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা "র" এর এজেন্ট উল্লেখ করে বলেছিলেন, "She is a paid agent of the research and Analysis Wing (RAW). She has minted millions from vested quarters in India writing only Bangladesh things".

(Sunday: 26th June—2nd July, 1994, India) (তসলিমা প্রসঙ্গঃ বিনীতভাষণ, সত্যবাক ৩০ শে অক্টোবর, ১৯৯৮ সাল, দৈঃ সংগ্রাম)।

১৯৪৭ এর আগে বা পরে এদেশ থেকে যে সব হিন্দু ভারতে গিয়েছিল, তাদেরকে তিনি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) উদ্বাস্তু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর। এর আগে কোন দিনও উদ্বাস্তু শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি সাম্প্রতিককালে এ দাবী তুলেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে। তিনি চান সেই ১৯৪৭ এর আগে বা পরে যে সব হিন্দু ভারতে (পশ্চিমবঙ্গে) গিয়েছিল (তিনিও গিয়েছিলেন) তারা আবার এদেশে ফিরে আসুক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত বা অলোচিত "পূর্ব পশ্চিম" উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলাদেশ সফরঃ এ বি সিদ্দিক, দৈ সংগ্রাম, ৬ই নভেম্বর ১৯৯৮ সাল)।

বস্তুতঃ তসলিমার আবির্ভাব এক সুদূর প্রসারী ঘটনা প্রবাহের এক ধারা বর্ণনা মাত্র। তসলিমা সমস্যা বাংলাদেশে বর্তমানে ২০০৩ সালেও সংঘটিত ধারাবাহিক অনেক ঘটনার সাথেই একসূত্রে বাধা । কার্যকারণেও দেখা যায় নাট্যকারেরা যখন উদ্দেশ্য মূলক নটিক রচনা করেন তখনও বেশ আঁচ করা যায় যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নাটকটি রচিত হতে দেখে আমরা দর্শকেরা উদ্দেশ্য মূলক নাটক হলেও বেশ উপভোগ করি তার ভাল দিকটির কথা চিন্তা করে কিন্তু যদি কোন খারাপ দেশ বিরোধী উদ্দেশ্যে কেউ এ রকম নাটক রচনা করে সেটাও এখন অনেকেই আঁচ করতে পারছেন। তখন সেই দর্শক মন্ডলীকে ভুলিয়ে রেখে দেশটির অনেক বড় বড় সর্বনাশ করা সম্ভব হয়েছে। আজ অনেকের কাছেই থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। তসলিমা ইস্যুর মূল সূত্র আজ আর কারোই অজানা থাকার কথা নয়। তার কার্যধারা দেশত্যাগে তাকে বাধ্য করে, বেদনার কথাটি হচ্ছে ধর্মের শুদ্ধি করতে যেয়ে তিনি দেশদ্রোহী হিসাবেই সমাজে চিহ্নিত হয়ে থাকলেন, এটাই তার সুনির্দিষ্ট পরিচিতি। ক্ষুদ্র মানচিত্রের দেশটিকে মেনে নিতে নাকি তার কুন্ঠা ছিল ঘুড়ির লেজের দেশের প্রতি তার আসক্তি কম ছিল। প্রতিপক্ষের হাতের চাল হিসাবে ব্যবহৃত দাবার গুটি যারা অতি অল্পেই হয়ে উঠে, যাদের অতি অল্পেই কেনা যায় তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** কিছু পাঠকের অভিযোগের ধারাবাহিকতায় আমাকে এ চ্যাপ্টারটি এবারের কলামে সংযুক্ত করতে হলো। আগের সংস্করণের সময় এটি অনুপস্থিত ছিল। প্রথমত আমি নিজেও এর গভীরতা আঁচ করতে পারি নি। এসব ঘটনা আমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল।

# শিকড়ের সন্ধানে

সেই চমকে দেয়া গ্রন্থটির আনন্দ পুরষ্কারে আশ্চর্য হয়েছিলাম এদেশের নানান মহলের সাথে সাথে আমিও এক মহিলা, আর তাই কৌতুহল মেটাতে হাতে নিয়েছিলাম নির্বাচিত কলাম। তসলিমার আবাল্যে নানান নগ্ন, নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। গালি দেবার সুবিধার্থে সত্য মিথ্যার প্রশ্রয়ও তিনি কম করেন নি। কোন যুক্তিতে আনন্দ মঠের পূজারীরা যে এমন একখানি নগ্ন, হঠাৎ চমকে দেয়া, অশ্লীল গ্রন্থকে আনন্দ পুরষ্কারে সম্মানিত করলেন বুঝতে পারলাম না। নুপুরের নিক্কন তুলে মঞ্চ নাড়িয়ে, পর্দা উড়িয়ে উত্থাল লাফালাফি করলেই কি জগতের সেরা নৃত্যশিল্পী হওয়া যায়? ভাল নৃত্যকলা আয়ত্ব করতে হলে তো তার তাল, লয়, মুদ্রা, এসব কিছু ভাল মতন আয়ত্ব করতে হয়।

সত্যিকারের বিচারকের রায় সব সময়ই যাচাই বাছাই করে হয়। সম্মানীর যোগ্য সম্মান দেয়া অবশ্যই পূণ্যের কাজ। গুণীর সমাদর গুনীরাই করে। শাহনামা রচনা করে ফেরদৌসী তার যোগ্য সম্মানী পান নাই বলে তার পাওনা সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বদলে রৌপ্যমুদ্রার এ সম্মান ঘৃণায় ধিক্কারের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনা ইতিহাসের কলঙ্ক হয়ে আছে। গুণীর গুণের সমাদর যারা করতে জানে না তারা মূর্খই বটে।

নাসরিনের এ আনন্দ পুরষ্কার এ যেন সেরকমই দুই প্রতিবেশী কে জিতলো কি দিয়ে নির্ধারণ করা যাবে, সেখানে ন্যায় অন্যায় সত্য মিথ্যা প্রাধান্য পেল না, প্রাধান্য পেল যে যত কোমরে কাছা বেঁধে বেশী অশ্লীল কথা আওড়ে বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠীর দফারফা করতে পারবে, যে যত গভীরে থেকে একে অন্যের শিকড় উপড়াতে পারবেন মিথ্যা দিয়ে হলেও, ঝগড়ার বিচারে সেই জিতলো। এখানেও ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছে। আনন্দ বাজারের দাদারা তাদেরই পুরষ্কৃত করবেন। মসজিদ যারা ভাংতে পারে, দাঙ্গা যারা বাধাতে পারে, খিস্তি যারা পাড়তে পারে, ওপারের আধুনিকতা, প্রগতি বুঝি এটাই! এদেরকে পুরষ্কৃত করতে হয় ঘটা করে। বেদ, বেদান্ত, মনু সংহিতা সবারই অপমৃত্যু ঘটেছে বাস্তবের মত ঐ কলামেও। তবুও তাদের মনে আনন্দ জেগেছে – ওরে ইসলাম তুই তো না হোক আজ আমাদের সাথে এক গলা পানিতে নামলি। আমরা তো আকণ্ঠ ডুবেই আছি। তোকে নামাতে পারলাম বলেই বুঝি ওপারের দাদাদের এ আনন্দ পুরষ্কার!!

আমাদের মহানবীকে নামাজরত অবস্থায় একগাদা নাঁড়িভুড়ি ফেলে দিয়েছিল জাহেল জালিমরা, তাতে কি রসুলের অপমান হলো? ছোট লোকই ছোট লোকের কাজ করে। ছোট মনই ছোট মনের পরিচয় দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্রের সাথে যুদ্ধ করা প্রবল পরাক্রান্ত সৈনিকের দৃষ্টিতে কাপুরুষতার লক্ষণ। তাই যোগ্যে যোগ্যে লড়াই, আজকের মাঠে জমে ভাল। একদিকে মিথ্যা আর অন্যদিকে সত্য এ দুয়ের লড়াই এ শুধু খিস্তি আওড়ানোর দক্ষতার উপর, কাউকে পুরস্কৃত করা সত্যতে গলা টিপে হত্যা করার নামান্তর।

কিন্তু ইতিহাস তো কথা বলে। তাই আসুন ইতিহাসের নিগড়ে আমরা আমাদের অবস্থান পরীক্ষা করে নেই। অতীত না ঘাটলে বর্তমানের হাদিস পাওয়া যাবে না। আমাদের অতীতই বলে দিবে, নির্দেশ দিবে আমাদের ভবিষ্যত নির্দেশনা কি হওয়া উচিত। মানুষ প্রাইমারী থেকে মাধ্যমিকে যায়, মাধ্যমিক থেকে উচ্চতরে উঠে; তাই জগত জীবনেও আমরা উন্নতি চাই অবনতি নয়।

সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ অবদি যত ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে ধর্মের স্তরে স্তরে উত্তরণ ঘটেছে। ইসলাম ধর্মকে সবচেয়ে আধুনিক ধর্ম হিসাবে ধরা যায়। কালের আবর্তে সকল পুরাতনকে ছাড়িয়ে সকল বাতিলকে ছাড়িয়ে এটা মানব জীবনের উত্তম পথ প্রদর্শণ করে বিশ্বধর্মের দাবী করে।

মুসলিমরা জগতের সকল মহাজনকেই তিনি যে যুগের ও যে দেশেরই হোন না কেন ধর্মতঃ ভক্তি করতে বাধ্য। এই প্রকার বিশ্বাস তার ঈমানের অংশ। নয়তো তারা মুসলিম হতে পারবে না। খৃষ্টান পাদরীগণ নিজেদের বাজার গরম করার জন্য বাইবেল নামে যে কিংবদন্তী রচনা করে গেছেন, তা মুসলমানের স্বীকৃত ইঞ্জিল নহে। পক্ষান্তরে বহুদিনের কাটছাট, অদলবদল, পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জনাদির পর, কয়েক শত বাইবেলের মধ্যে যে কয় খানাকে তারা পাদরীদের ভোটের আধিক্যে গ্রহণ করেছেন অন্ততঃ কুরআনের বর্ণিত হযরত ঈসার সহিত তার সামঞ্জস্য খুবই কম। ইসলামের ‘তকদির’ নাস্তিকের জড়বাদ নহে, কর্মবিমুখ কাপুরুষের অদৃষ্টবাদও নহে, ইহা বিশ্বাস ও কর্মের সাধনার সমষ্টি। এক আশ্চর্যজনক বিধানলীপি শুধু সচেতনদের জন্য, যুক্তিবাদীদের জন্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উত্তম মানুষের জন্য।

# ইসলামের পূর্বে জগতের অবস্থা

বস্তুতঃ তখন অজ্ঞতার নামই জ্ঞান, অধর্মের নামই ধর্ম এবং সকল ঘৃণিত ব্যভিচারই সমাজে সাদরে সমাদৃত ছিল। ইসলামপূর্ব জীবন বলতে আসলে কিছুই নেই। কারণ সকল যুগেই ইসলাম তার মানবিক ধারার প্রমাণ রেখে গেছে সেই আদম থেকে শুরু করে আজ অবদি। তবে হ্যাঁ পরিপূর্ণ ইসলাম মানুষের পরিমন্ডলে সুনির্দিষ্টভাবে আসে মাত্র চৌদ্দশত বছর আগে এবং তার কর্ণধার ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ) যার হাত দিয়ে মানবিক ধারাবিবরণী নেমে আসে ঐ সিলেবাসে। সেই সিলেবাসটি হলো আল-কু'রআন। যখনই দেখা গেছে মহাপুরুষেরা চলে গেলে মানুষ আবার সব ভুলে গিয়ে তার পূর্ববর্তী অপকর্মে ডুবে গেছে মহানন্দে। সেই অপকর্মের নামে তারা চলায় সব ধরণের অনাচার বিশেষ করে শিরক, আল্লাহকে ছেড়ে মিথ্যা ধর্মাচার। দেখা যায় নবী মুসার সময় তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে জনতারা কেমন করে আবার নিজ হাতে বানানো সোনার তৈরী গরুর পূজা শুরু করে দেয় যার জন্য তার বড়ভাই হারুণকে অনুতপ্ত হতে দেখা যায়। এ সবের সন্ধান আমরা পাই সুনির্দিষ্টভাবে সেই কু'রআন গ্রন্থটিতে। যাক এবার আমরা সেই চৌদ্দশত বছরের পূর্বেকার অবস্থার দিকে একটু আলোকোপাত করবো। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার সর্বত্রই দেখা যায় এই সময়টিতে অজ্ঞানতার কঠিন অন্ধকারে প্রায় পৃথিবীর প্রতিটি জাতিতে অধর্ম, অনাচারই যেন মানব জাতিকে শাসন করার জন্য অবস্থান নেয়। এ যাবত যেসব ঐশী বাণী মানুষ রপ্ত করেছিল তার সবকটিতে মানুষ নামের অপকর্মকারীরা মনের মাধুরী মিশিয়ে তাতে রং, ঢং মিশিয়ে কিম্ভুৎকিমাকার করে তোলে যেখান থেকে সত্যিকারভাবে ধর্মের সঠিক দিকদর্শন হারিয়ে যায়।

## তখনকার ভারতবর্ষের অবস্থা:

জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রাচীন আবাসভূমি ভারতবর্ষের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে করা উচিত। তখনকার হিন্দু সমাজের সমবেত বিশ্বাস হিসাবে বেদই এদেশের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং অধিকাংশের মতে ইহা অপৌরুষের স্বর্গীয় বাণী।

তবে বেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্ডিতদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, প্রকৃত বেদের শিক্ষা নিরাকার একেশ্বর ব্যতীত আর কিছু নয়। তখনকার দিনে লেখার প্রচলন না থাকাতে প্রকৃত বেদের শ্লোকগুলির কিছু অংশ কালক্রমে বিলুপ্ত এবং কিছু অংশ অবস্থা বিপর্যয়ে বিকৃত হয়ে পড়ে এবং বেদ আবির্ভাবের পরবর্তী যুগে আর্য কবি, নীতিকার ও পন্ডিতবর্গ যে শ্লোক ও গ্রন্থ রচনা করেন, তার এক অংশও কালক্রমে সেই প্রকৃত বেদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মোটের উপর প্রকৃত বেদের সেই বিকার এবং একেশ্বরবাদের বিকার আদি যুগ থেকেই চলে আসছে। বেদের শিক্ষায় দেখা যায় ঈশ্বর "অজ একপাৎ" তিনি "অকায়ম", তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম" অর্থাৎ তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি মঙ্গলময়। তিনি একক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন কায়া হতে পারে না এবং "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" অর্থাৎ তার কোন প্রতিমা নেই।

কুরুক্ষেত্রের কাল সংগ্রামের ফলে আর্য্য জাতির চিন্তাধারায় যে ঘোর অধঃপতন ঘটেছিল পরবর্তীতে তার অনেক দলিল প্রমাণ পাওয়া যায়। এর ফলে আর্য্যধর্ম ভারতবর্ষ হতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং হিন্দুধর্ম এসে তার স্থান অধিকার করে বসে। হিন্দুস্থানে আবির্ভূত যে কোন মতবাদ হিন্দু ধর্মের বিশাল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার অধিকারী; সে ধর্মনীতি বিরোধী হোক, জ্ঞান বিরোধী হোক, সত্য বিরোধী হোক আর বেদ বিরোধীই হোক, তা বিচার করার আর কোন প্রয়োজন হয় না।

ভারতবর্ষের জৈনদিগের নাস্তিকতাবাদ কালে ঘোর পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হয়ে গেল। আর্যাবর্তের হিন্দুরা জৈনদের অনুকরণে বেদের নিরাকার ঈশ্বরকে বিসর্জন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের তীর্থঙ্করদের বহু সংখ্যক বিরাটকায় পাষাণ মূর্তি গড়ে নিয়মিতভাবে শুরু করে দিল ঈশ্বর রূপে বা অবতাররূপে পূজাঅর্চনা। শঙ্করাচার্য্য এই সর্বনাশা স্রোতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু একথা সত্য যে, জৈন মতবাদের প্রভাবকে ভারতবাসীর মন ও মস্তিষ্ক হতে মুছে ফেলা তার ও তার অনুসারীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়ে উঠেনি।

সুনীতি ও সদাচারের দিক দিয়া ভারতবর্ষের যে ঘোর অধঃপতন ঘটেছিল তা বর্ণনাতীত। তারা একদিকে নতুন নতুন অবতারের সৃষ্টি করে যেমন সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার আসনে বসিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল ঠিক একইভাবে মানুষকে তারা শিয়াল কুকুর ও গর্দভেরও অধম মনে করতো। নিম্ন শ্রেণীর জনতার নামে এই নির্মম অসাম্যের কাজটিও করা হয়েছে সেই ভগবান মনু, ঋগ্বেদ এদের নামে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নামে যে বিধানে নিম্নবর্ণের প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিল সেখানে সব ধরণের পাপে ডুবে থাকলেও একজন ব্রাহ্মণকে বধ কখনোই করা হবে না। শুধু ঐ অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের মাথা মুড়িয়ে দেয়া যাবে – এটিই শাস্ত্রের বিধান।

এই অবতারবাদের অভিশাপ ভারতবর্ষের পন্ডিত পুরোহিতদিগের মস্তিষ্ককে এমনভাবে কলুষিত করে ফেলেছিল যে, মাছ, কচ্ছপ, শুকর এর মত নিকৃষ্ট জীবকে পর্যন্ত ঈশ্বরের অবতার বলে কল্পনা করতেও তারা একটুও কুন্ঠাবোধ করে নাই। ক্রমে ক্রমে জড় পূজা, প্রতীক পূজা, প্রেত পূজা, নর পূজা ও পুতুল পূজার সব অভিশাপ এসে ভারতবর্ষের অনাবিল একেশ্বরবাদকে বিধ্বস্ত করে ফেললো।

আমাদের আজকের প্রসঙ্গ নারী এবং এই নারীকে তখনকার শাস্ত্রকারেরা ভারতবর্ষীয় ইতর, ভদ্র সকল শ্রেণীর নারী সমাজের প্রতি যে অমানুষিক অবিচার করে গিয়েছেন, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও পুরাণ ইতিহাসে তার যথেষ্ট নিদর্শন আজও বিদ্যমান। স্বত্ব ও অধিকার বলতে নারীর তখন কিছুই ছিল না, নারী তখন সমাজের দুর্ব্বহ বিপদ অথবা কাম চরিতার্থ করার সম্বল মাত্র। যে বেদকে তারা জ্ঞানময় পরমব্রহ্মের বানী বলে বিশ্বাস ও প্রচার করতেন, সেই ভাগবৎবানীর একটি বর্ণ উচ্চারণ, এমনকি শ্রবণ করার অধিকারও নারীর ও শুদ্রের নাই। কোন শুদ্র বা নারী ঐ ঐশিক বাণী শ্রবণ উচ্চারণরূপে মহাপাতকে লিপ্ত হলে রাজা অবলম্বে তাহার প্রাণ বধ করবেন (সূত্রঃ অত্রি সংহিতা, ১৩৫ ও ১৯)।

মনুর ভাষ্যে,"যেহেতু মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীলোকের জাতকর্মাদি সংস্কার হয় না, এজন্য উহাদের অন্তঃকরণ নির্মল হতে পারে না। যেহেতু বেদ স্মৃতিতে তাদের কোন অধিকার নেই, এজন্য তারা ধর্মজ্ঞও হতে পারে না। পাপ করিয়া কোন মন্ত্র আবৃত্তির দ্বারা যে তার স্থালন করবে, সে সুযোগও তাদের নেই কারণ কোন মন্ত্রে তাদের অধিকার নেই" (মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়)।

ভারতের দায়ভাগ নারীকে একপ্রকার গণনার বাহিরে রেখেই সম্পত্তি বন্টনের ব্যবস্থা দিয়েছে। বিবাহে তার মতামতের কোন স্থান নেই। বিবাহ বন্ধন ছেদনেরও কোন অধিকার তার নেই। অষ্টবিধ শাস্ত্রসম্মত বিবাহের গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে তখনকার নারীসমাজের শোচনীয় দুরবস্থার কথা আঁচ করা যায়। অতঃপর নারীকে দেখা যায় তান্ত্রিকের বিভৎস ভৈরবী চক্রে, জঘন্য অনাচারে, অথবা ধু ধু প্রজ্জ্বলিত চিতাকুন্ডের সর্বগ্রাসী দাবানলে অথবা তুমুল তুফান সঙ্কুল গঙ্গা–সাগর সঙ্গমে---হাঙ্গর কুমীরের সর্বনাশা কবলে। আজো শুনা যায় একবিংশ শতাব্দীতেও কখনো কখনো রূপকনোয়ারের পরও গুট্টবাঈরা তাদের জীবন চিতার আগুনে দাহ করে চলেছেন।

## তখনকার চীনের অবস্থা:

চীনের ঐতিহাসিক পন্ডিতদের মতানুসারে কনফিউসিয়াস কোন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা কোনদিনই করেননি। নিজের সাধনায় বিদ্যা ও জ্ঞান দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে কনফিউসিয়াসের মতবাদ বলে যে ধর্মপদ্ধতিটা চীনদেশে বলবৎ ছিল তার সার কথা প্রকৃতি পূজা ও পূর্বপুরুষের পূজা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু "তাও" মতবাদের আবির্ভাবে তার আদর্শটাও একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হতে চীনদেশে বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাব শুরু হয়। এই নবাগত মতবাদের সংযোগ ঘটায় চৈনিক সমাজের ধর্মগত, জ্ঞানগত ও আদর্শগত পতন অপেক্ষাকৃত দ্রুততরই হয়ে উঠে।

## পারস্যের অবস্থা:

ভারতীয় আর্য্যদের মত প্রকৃতি পূজাই ছিল তাদের প্রাথমিক ধর্মের প্রধান অঙ্গ। আবেস্তা ও গাথা থেকে জানা যায় জরদশতই পারস্যের পয়গম্বর বা মহাপুরুষ ছিলেন। ঐশিক বাণীপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে তিনি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন। জরদশত পারসিকদেরে অন্ধ বিশ্বাস হতে মুক্ত করে তাদেরে এক, অদ্বিতীয় ও নিরাকার ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় যে, জরদশতের পরলোকের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাপ্ত ঐশিক বানী, তার সমস্ত উপদেশ ও গাথা নানা কারনে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ ইসলামের সমাধান সমাগত না হওয়া পর্যন্ত পারস্য দেশ ধর্ম, সুনীতি, সদাচার ও সামাজিক শান্তি লাভ করতে আদৌ সমর্থ হয় নি।

## ইহুদী জাতি:

ইহুদী জাতির অবস্থাও তখন শোচনীয়। একদিকে তারা কর্মবিমুখ হয়ে কেবল মসিহের আগমন প্রতীক্ষা করছে। মসিহ এসে তাদের মুক্তি সাধন করবেন। সমস্ত জগতের উপর আবার ইহুদীদের রাজত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, এই আশায় তারা অলসভাবে বসে ছিল। তাহারা তখন নিজেদের ধর্ম শাস্ত্রের প্রতি গাফেল হয়ে, হযরত মুসার মূল উপদেশ বিস্মৃত হয়ে পৌরহিত্য ধর্ম ও পৌরাণিক আজগুবী গল্পগুজবসহ শাস্ত্রের বাধনকে কঠোর থেকে কঠোরতর করা এসবই ছিল তাদের প্রধাণ সাধনা। এজন্য আত্মকলহ, বিবাদ-বিসংবাদ ও শাস্ত্রীয় জালিয়াতির ব্যবসা তাদের মধ্যে উৎকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরোহিত এবং রাহেবগণই বস্তুতঃ তখন তাদের ঈশ্বর, কারণ তাদের রচনাগুলিই ঐ কল্পিত শাস্ত্রের দিকনির্দেশক হিসাবে সমাদৃত হয়ে আসছিল।

খৃষ্টানদের সহিত বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে যীশুর জন্ম ও স্বর্গারোহন ইত্যাদি বিষয়ের খৃষ্টানী সংস্কারগুলি সম্বন্ধে তারা অতি কঠোর ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করছিল। জারজ, শাস্ত্রদ্রোহী, কাফের ইত্যাদি বলে অভিশপ্ত, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পাপাত্মা বলে যীশু সম্বন্ধে তারা অতি নিকৃষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করে।

## খৃষ্টান ধর্ম:

খৃষ্টান জগতের অবস্থা তখন আরো শোচনীয়। যীশুর প্রকৃত শিক্ষা তখন জগৎ হতে লুপ্তপ্রায় এবং কতিপয় কল্পিত কিংবদন্তী মাত্র তার স্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে। এক নম্বর ঈশ্বরের আদেশ মতে, দুই নম্বর ঈশ্বর যীশুর মাতা মেরী, তিন নম্বর ঈশ্বর পবিত্রাত্মা কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে যীশুকে প্রসব করেছিলেন। যীশুর সঙ্গে তার মাতা মেরীর মূর্তিপূজা তখন খৃষ্টানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে পল, পিটার্স প্রভৃতি সাধুগণের প্রতিমূর্তিও ভজনালয়ে প্রকাশ্যভাবে পূজিত হতে লাগলো। নামে

খৃষ্টান হলেও প্রকৃত পক্ষে তারা পৌল ধর্মই গ্রহণ করেছিল। স্বর্গের পাসপোর্ট একমাত্র পোপের আলমারীর মধ্যে বন্ধ ছিল।

পোপ ঈশ্বরের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বর, সর্বময় কর্তা। খৃষ্টানদিগের দ্বারা সৃষ্ট, পুষ্ট, ও প্রতিষ্ঠিত মূর্খতার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করারও কোন অধিকার তখনকার সমাজে ছিল না। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করিলেই একদম মুক্তি। মহাপাপিষ্ট হলেও কোন অসুবিধা নেই। দাস এবং নারীর দীর্ঘশ্বাসে তাদের অতীত সমাজের নিদারুণ পৃষ্ঠাগুলি কঠিন কষ্টে আজো জীবন্ত হয়ে আছে।

## তখনকার আরব:

তখনকার আরব কতকটা নাস্তিক, কতকটা পৌত্তলিক এবং কতকটা অংশীবাদী ছিল। এমনকি, কালে অংশীবাদী ও পৌত্তলিকতার প্রধানতম শত্রু হযরত ইব্রাহিমের প্রস্তরমূর্তিও তওহীদের আদীকেন্দ্র কাবা মসজিদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কথিত আছে যে, সে সময় কাবায় ৩৬০টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হযরতের জন্মের পূর্বে সমস্ত আরব ধর্মহীনতা, পৌত্তলিকতা, জড়পূজা ও অংশীবাদ হয়ে সমাজে ধর্মকর্ম করছিল। এটাই ছিল তাদের আস্তিকতা। মুখে আল্লাহর নাম করলেও তারা পূর্ববর্তী সব একেশ্বরবাদীতা ভুলে গিয়ে আবারও সব ধরণের অনাচারকে নিজের মত করে ধর্মের মানদন্ডেই পালন করতো। পুতুল পূজা, প্রেত-পূজা সহ বড় বড় গাছপালা পূজা করার প্রথাও তারা পালন করতো। মন্ত্র, তন্ত্র, যাদু, টোটকা দ্বারা এবং তাবিজ কবচসহ সব ধরণের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসই ছিল তাদের তথাকথিত ধর্ম। মদ্যপান ও জুয়াখেলা ছিল তাদের আনন্দ ও আমোদের বস্তু।

সে সময় পৃথিবীতে একজন সংস্কারক ও ত্রাণকর্তার ভীষণ প্রয়োজন হয়েছিল। তখন আরব ব্যতীত জগতের প্রত্যেক জাতিই মানুষের রচিত এক একটা ধর্মপদ্ধতি বা ধর্ম শাস্ত্রের অনুসরণ করছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জগতে যতগুলি প্রধান প্রধান জাতি ছিল, তাদের প্রত্যেকটিই মানুষের রচিত কুসংস্কারে ও অন্ধ বিশ্বাসপূর্ণ তথাকথিত ধর্মের চাপে নিজেদের মনুষ্যত্বকে পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছিল। ভৌগলিক হিসাবে আরবদেশ বিশেষতঃ মক্কা নগরী ভূমন্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সম্ভবতঃ তাই আল্লাহর ন্যায় বিচারে আরবই জগতের মুক্তিদাতারূপে নির্বাচিত হলো।

# উপসংহার

একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ছাড়া কোন কাজই হয় না। আর মহৎ কাজ, ভাল কাজ তো অবশ্যই না। ১৯৯৬ সালের গত ৬ এপ্রিল আমি এই বই লিখার কাজে হাত দেই। অবশ্যই চরম উৎসাহ নিয়ে এবং সারাদিনের কাজের ফাঁকেও রাতেও কাজ চালিয়ে গেছি। একটা খসড়ার মাপে দাঁড় করিয়েছি বইএর কাঠামোটি। খুব স্বল্প সময়ের এই জবাবখানা প্রকাশিত হবার প্রস্তুতি নিবে, আমার জীবনের প্রথম লেখা হিসাবে এক উপস্থাপনা। সবচেয়ে আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগছে এই কারণে যে, এটিই আমার জীবনের বলতে গেলে প্রথম লেখা এবং তাও একটি বই। শুধু মাত্র সে কারনেই এটা আমার কাছেও এক চরম বিস্ময় বৈকি?

শুরুতে আমার লেখা খারাপ ভালো কি যে হয়েছে কিছুই আমার বোধের মধ্যে নেই। তবে তসলিমা নাসরিনের নানান উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর দেবার আমি চেষ্টা করেছি অবশ্যই কিন্তু সাহিত্য যে কতটুকু হয়েছে তার মূল্যমান আস্তাকুড়ে ফেলার যোগ্য কি না, তা পাঠকরাই বিবেচনা করবেন। সর্বাগ্রে আমার একটা মিনতি আপনারা আমার প্রতি কঠোর হবেন না, এ আমার হাতেখড়ি মাত্র। আর এ হাতে খড়ি নিতে আমাকে বাধ্য করেছেন নাসরিন, যার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ভালো হোক বা মন্দ হোক আমি আমার পক্ষ থেকে আমার জমানো পুঞ্জিভূত ক্ষোভ যা এসে ভিড় করেছিল আমার মনের মনিকোঠায়, তা লেখার ভাষায় তার উত্থাপিত নানান প্রশ্নের জবাব হিসাবে দিতে চেয়েছি।

একজন চিত্রকরের ভাষায় বলবো মোনালিসার ছবি না হোক, বস্তীর উড়ণী মেয়ের ছবিও যদি হয় আমার এই উপস্থাপনা তাও মন্দ কি? কেউ যদি বলে হ্যাঁ, পুরষ্কার তোমাকে দেয়া যাবে না তবে স্বীকৃতিটুকু দেয়া যেতে পারে। ওটাই কম কিসে?

পেশায় নাসরিন, আপনি ডাক্তার। দুর্ভাগ্য আমার! আমি যে স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করি সেবছর থেকেই আমাদের স্কুলটির এস এস সি পরীক্ষার অনুমোদন পায়। যার কারণে এতো স্বল্প সময়ের মাঝে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান বিষয় খুলতে অপারগ ছিলেন বলে গোড়াতেই কিছু বাধাগ্রস্থ হই। আপনি ডাক্তারের মেয়ে, আমিও। আপনার মা তাহাজ্জুদ পড়তেন আপনি টিটকারী দিয়েছেন। আমার মা বাবা দু'জনাই তাহাজ্জুদধারী ছিলেন, আর আমাদেরেও তাহাজ্জুদের এ দুর্লভ আনন্দ ভোগ করার তাগাদা দিয়ে গেছেন। আপনার বাবা আপনাকে পড়ার তাগাদা দিতেন। আমার বাবাও কলমের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করার অর্থ্যাৎ লেখাপড়ার উপর সবসময় জোর দিয়ে গেছেন। ধর্মের অনেক কঠিন কঠিন তত্ত্ব সহজভাবে বাস্তব ঘটনার আলোকে আমাদেরে বুঝিয়ে দিতেন।

তাই আজ আমি যতটুকু লিখতে পেরেছি এ আগ্রহ, এ উদ্দীপনা সম্পূর্ণ আমার নিজের নয়, আমার মা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমি তার কিছুটা প্রাপ্ত হয়েছিলাম মাত্র। সমাজের ছোট খাটো দোষ ত্রুটি, কুসংস্কার, খুব সুন্দর যুক্তির মাধ্যমে আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হতো যার কারণে আমার অনেক সহপাঠীদের থেকেও আমি একটু স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ছিলাম সব সময়।

লেখাপড়ার অদম্য আগ্রহ ছিল বলে বিয়ের পরও পড়া চালিয়ে যাই এবং ইসলামের প্রতি একটা নাড়ীর টান থাকার কারণেই সম্ভবতঃ ইসলামিক হিস্ট্রি এন্ড কালচারে পড়াশুনা করি। তা ছাড়াও সব সময় বস্তুনিষ্ট

ইসলামিক লেখাপড়া খুবই পছন্দ করি। তবে ইসলামের নামে যত অপসংস্কৃতি, মিথ্যা, ভাড়ামি, বাড়তি জঞ্জাল এসে স্তুপাকার হয়েছে, এগুলোর দ্রুত অপসারণের আমি পক্ষপাতি।

বইটির ইতি টানার আগে এদেশের এক চিন্তাশীল ব্যক্তির একটা উদ্ধৃতি টেনে তার সাথে আমার মতামতের একাত্মতা প্রকাশের সাথে সাথে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করবো। ডাঃ এম, এ, শুকুর তার "নিষিদ্ধ বৃক্ষ" নামে একটি গবেষণা ধর্মী বইএ উল্লেখ করেন "শেষ জামানায় সূর্য পশ্চিমে উদিত হবে" এই হাদিসের ব্যাখ্যায় অনেকে মনে করেন সূর্য বুঝি পূর্ব আকাশ ছেড়ে পশ্চিমে চলে যাবে। উক্ত লেখকের বক্তব্য অনুসারে এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে এই যে, শেষ জামানায় সূর্য (অর্থাৎ ইসলামের সূর্য) পশ্চিমের দেশ সমূহে উদিত হবে এবং হচ্ছেও তাই। লেখক নিজে তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন ইসলাম নামীয় সূর্যের পশ্চিমে উদিত হয়ে আসার কাজটা ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে আসছে। তার বই থেকে একটি প্যারা উদ্ধৃত করে আমি 'তসলিমার কলামের জবাব' এখানেই সমাপ্তি টানবো। আল্লাহ আমাদের সহজ সরল পথ অর্থে সিরাতুল মোসতাকিমে থাকার তওফিক দান করুন।

"শেষ জামানায় এরূপ একটি গণজাগরণ যে ঘটবেই তা বর্তমানে প্রচলিত ধর্ম দর্শন ও রাষ্ট্র ব্যবসার ব্যর্থতার কারনেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মকে উপলক্ষ করে যে তিনটি স্থানে (কাশ্মীরে, প্যালেষ্টাইনে, এবং বসনিয়ায়) মুসলমানদের উপরে যে গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালানো হচ্ছে তাতে খৃষ্টধর্ম, জুডাইজম, ও ভারতীয় বর্ণবাদীদের ধর্মের নামে সত্য শান্তি এবং গণবাদের কথা বলার কোন অধিকার আর থাকেনি। সুতরাং স্বভাবত একমাত্র ইসলাম এবং ধর্মীয় শাস্ত্র হিসাবে একমাত্র কুরআনই দিতে পারে আগামী শতাব্দীর মানুষের সমস্যার সমাধান।"

**প্রমাণ পঞ্জীমূলক গ্রন্থাবলী:**


(১) ইসলাম মনীষার আলোকে ---দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

(২) সহজ সঠিক বাংলা কুরআন---আলহাজ ডাঃ জহুরুল হক।

(৩) মোস্তফা চরিত----মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

(৪) বেলাজ তসলিমা নাসরিন এর স্বরূপ---আবু মাহিন।

(৫) নিউজ লেটার, বাংলাদেশ।

(৬) "গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা বাংলাদেশে "র" আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরুপ সন্ধান" লেখক আবু রুশ্‌দ, ৩০ পৃষ্ঠা; প্রথম প্রকাশ-১লা মে ১৯৯০ সাল।


বিভিন্ন সংকেতাবলী কুরআনের ভাষ্যতে।

লেভ--লেভিটিকাস (পূর্বভাগ)

ক্রনি--ক্রণিকল (পূর্বভাগ)

সামু--সামুয়েল (পূর্বভাগ)

তির--তিরমিযি (হাদিস)

জেনে--জেনেসিস (পূর্বভাগ)

আবু--আবু দাউদ (হাদিস)

বুখারী--বুখারী (হাদিস)

বেক কভার পেজ:

আপনি চান নারী তার জরায়ু নিয়ে ব্যবসা করুক। বংশ রক্ষার নামে কুক্কুরীর মত স্বাধীনতা ভোগ করুক। মাতৃত্বের নামে নরহত্যা বা পুত্রহত্যা করতে চান, সম্ভবতঃ?
ধিক! আপনার নারী জনম!!! উশৃংখল বন্য জীবনই আপনাদের মত চিন্তাশীলদের শান্তিনিকেতন হওয়া উচিত। সমস্ত নারীদের মুক্তির জন্য আমি স্রষ্টার সাহায্য চাই। আল্লাহ যেন নারীদেরে সত্য ও সুন্দরের রাস্তায় চলার তওফিক দান করেন। পৃথিবীকে মানুষের যোগ্য আবাস হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালান। আর দানব নৃত্য নয়, সত্য ও সুন্দরের সাধনা করুন। শিক্ষার আলোই নারীকে মুক্তি দেবার একমাত্র বাহন, এটাই আমার বিশ্বাস।
*****